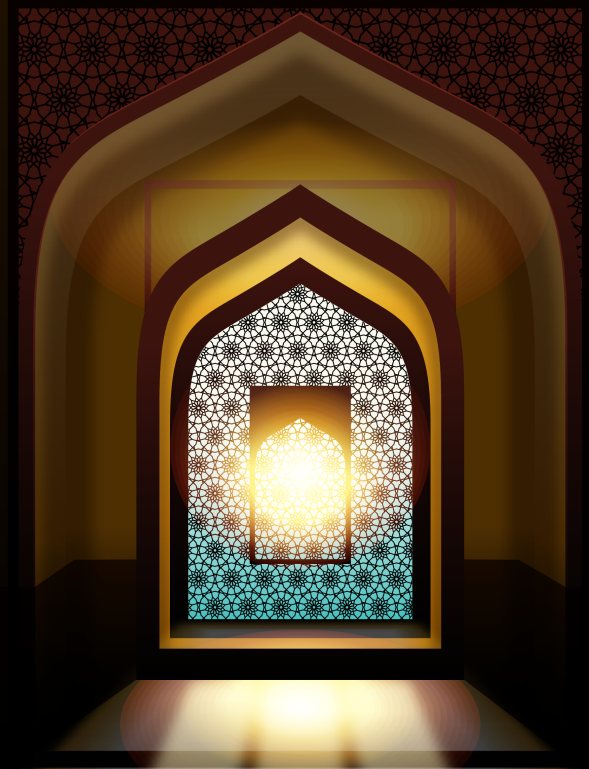


দরমগাহ

জিলক্বদ ১৪৪৩

থাকছে

- তাফসিরে সুরা বাকারাহ
 - গোয়া ইনকুইজিশন
পর্তুগিজ শাসনের কালো
অধ্যায়
 - ইলম অর্জনের
মুতাওয়ারাস ধারা
 - ইসলামে মধ্যপন্থা বনাম
মডারেটিজম
- ধারাবাহিক সিরিজসমূহ
সহ আরো অনেক কিছু...



আর তার চেয়ে কার
কথা উত্তম যে
আল্লাহর দিকে
আহবান জানায়
এবং সৎকাজ করে।
আর বলে, অবশ্যই
আমি মুসলিমদের
অন্তর্ভুক্ত।

সুরা হা-মীম আস-সাজদা,
আয়াত ৩৩



দর্শগাহ
জিলক্বদ ১৪৪৩



গ্রন্থস্বত্ব © দর্শগাহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
টিম দর্শগাহ

ফেসবুক পেইজ লিংক
facebook.com/darshgahbd

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
t.me/darshgahbd

ইউটিউব চ্যানেল লিংক
www.youtube.com/Darshgahbd

অনলাইন পরিবেশক
ইকরা পাব্লিকেশন

- ০৫ তাফসিরে সুরাতুল বাকারাহ
উস্তাদ মুহাম্মদ সাঈদুল মোস্তফা
- ১৭ মৃত্যুর সমাপ্তি
শায়খ ইবনু নাসির
- ১৮ সেই মানুষটার গল্প বলি
আসিফ আদনান
- ২২ গোয়া ইনকুহিজশন
পর্তুগিজ শাসনের কালো
অধ্যায়
উস্তাদ ইমরান রাইহান
- ২৮ ইলম অর্জনের মুতাওয়ারাস
ধারা
উস্তাদ মাহমুদ সিদ্দিকী
- ৪০ ইসলামে মধ্যপন্থা বনাম
মডারেটিজম
উস্তাদ হুজাইফা আওয়াদ
- ৪২ স্বাধীনতা বনাম দাসত্ব
শায়খ আব্দুল আজিজ আত ত্বারিফি
- ৪৫ বিজ্ঞান আমার ঈমান নাড়িয়ে
দিয়েছে
হামযা জর্জিস
- ৪৮ মিথ্যা
শায়খ আহমদ মুসা জিব্রীল

ধারাবাহিক সিরিজ

৫০

কুরআনিস্ট মতবাদের সূচনা
ও ইতিহাস এবং তাদের ভ্রান্তি

উস্তাদ আম্মারুল হক

৫৫

উন্মাহর মহীরুহ

শায়খ আহমদ মুসা জিব্রীল

শুরুর কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রসুলিল্লাহ।

সময়টা ফিতনার। চারদিকে অন্ধকার। নব্য জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত এই সমাজ। কিন্তু এই অন্ধকার থেকে আলোতে প্রত্যাবর্তনের রাস্তা এখনও খোলা আছে। সুযোগ আছে মানবসভ্যতার সত্যিকারের উৎকর্ষ সাধনের, আর তার মাধ্যম হলো ওহী ভিত্তিক জ্ঞান। রাতের অন্ধকারে পথ চলতে যেমন আলোর দরকার, তেমনি এই জাহালত থেকে উত্তরণের জন্য চাই ওহীর জ্ঞান। দরসগাহ ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকে কাজ করছে। আমাদের উদ্দেশ্য ওহীর শিক্ষাকে নবীগণের (ইলমের) ওয়ারিশদের থেকে সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আলহামদুলিল্লাহ এরই ধারাবাহিকতায় আমরা মাসিক ম্যাগাজিন "দরসগাহ" প্রকাশ করছি। আমরা চেয়েছি আলিমগণের সাথে সমাজের মানুষের একটি সম্পর্কস্থাপন করার যেখানে দ্বীনের দাঈরা হবেন ব্রিজ যার এক প্রান্তে সাধারণ মানুষ এবং অন্যপ্রান্তে নবীগণের ওয়ারিশ।

ডা. মুর্তজা শাহরিয়ার
প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক, দরসগাহ



তাফসিরে সূরাতুল বাকারাহ

মুহাম্মদ সাঈদুল মোস্তফা

আমরা এখানে সূরা বাকারাহ থেকে তাফসির করা শুরু করেছি। কেননা কুরআনের শুরু থেকেই যদি আমরা তাফসিরটা বুঝতে শুরু করি তাহলে পরবর্তী তাফসিরগুলো নিজে নিজেই পড়ে উপলব্ধি করতে পারবো। কারণ তাফসির করার জন্য যেমন কিছু উসূল থাকে তেমনি তাফসির পড়ার জন্য, বুঝার জন্যও কিছু উসূল বা নিয়ম-নীতি আছে। এসব উসূলগুলো আমরা মাঝে মাঝেই আলোচনায় আনব যাতে পরবর্তীতে এসব আয়ত্ত করে নিজে নিজেই তাফসির বুঝতে পারি সবাই।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কেন সূরা ফাতিহা থেকে শুরু করছি না? মূলত আমরা যখন তাফসির পড়তে যাই, তখন এর ১ম উসূল হচ্ছে, কোন সূরার তাফসির করার আগে তার পূর্ববর্তী সূরার সাথে বর্তমান সূরার কি সম্পর্ক তা নিয়ে আলোচনা করা। তাই যখন আমরা সূরা বাকারাহ তাফসিরের দিকে যাব তখন এর সাথে সূরা ফাতিহার কি সম্পর্ক তা আলোচনা করব। ঠিক কোন জায়গাটির সাথে কোন জায়গা সম্পর্কিত সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। এভাবে একইসাথে সূরা ফাতিহার তাফসিরও আয়ত্ত করা হয়ে যাবে। তাফসির জানার জন্য অনেক মুফাচ্ছিরগণ একটা শব্দ বলেন। 'ইয়াকিন' অর্থাৎ এই কুরআন (কালামুল্লাহ) 'আল্লাহর বাণী' এই কথাটির উপর আমাদের যতটুকু ইয়াকিন বা বিশ্বাস থাকবে ঠিক ততটুকুই আমরা তাফসির থেকে উপকৃত হতে পারব।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আমি আমার বান্দার সাথে ওইরকমই আচরণ করি, সে আমার প্রতি যেমন ইয়াকিন/সুধারণা/বিশ্বাস রাখে”।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের এই সুধারণা কিভাবে আসবে? বেশি বেশি কুরআনের তাফসির পড়ার মাধ্যমে, বুঝার মাধ্যমে। আমাদের মনোজগৎ, আধ্যাত্মিকজগৎ, আমাদের অন্তর, আমাদের স্বভাব-চরিত্র এভাবে অবস্তুগত বিষয় আছে আমাদের মধ্যে সেগুলো modify হবে, motivated হবে, এগুলোর উপর কুরআন প্রভাব ফেলবে

তখনই যখন আমরা এর তাফসির পড়ব। যখন আমরা কুরআন পড়ব তখন এই ইয়াকিন/বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এই কথাগুলো আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আল্লাহ তা'আলার চেয়ে সত্যকথা বলতে পারে এমন কেউ কি আছে?” (সূরা নিসা-১২২)

নেই।

এমন কাউকেই পাওয়া যাবে না। তাহলে আমাদের প্রথমে ইয়াকিন তৈরি করতে হবে যে আল্লাহ যা বলেছেন তাই সত্য, কোনো সন্দেহ নেই। এই ইয়াকিন যদি আমরা তৈরি করতে পারি তবে তাফসির আমাদের উপর প্রভাব ফেলবে। আমাদের ঈমান-আক্বীদা, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের চরিত্র, মনোজগত প্রতিক্ষেত্রে আমরা এই তাফসিরের ছোঁয়া পাব।

আমরা সূরার একটি আয়াতের সাথে আরেকটি আয়াতের কি সম্পর্ক এদিকেও তাকাবো আবার এর আগের সূরার সাথে কি সম্পর্ক তাও জানবো।

“বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম” আয়াতটি কুরআনের প্রতিটি সূরার শুরুতেই আছে শুধু সূরা তাওবা বাদে। এর তাফসির করতে হলে পুরো কুরআন চলে আসবে তাই শুধুমাত্র এর সংক্ষিপ্ত তাফসির নিয়ে আলোচনা হবে।

যেকোনো ভালো কাজের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন আমরা যেন “বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম” দিয়ে শুরু করি। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণবাচক নাম উঠে এসেছে। রহমান ও রহীম। এই দুটি শব্দের উতপত্তি একই মূলধাতু থেকে, তা হলো “রহম” বা “রহমাহ” অর্থ দয়া। অর্থ একই হলে দুটি আলাদা শব্দ কেন আনলেন? রহমান- এখানে আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন, তিনি সাধারণভাবে তার প্রতিটি মাখলুকের প্রতি দয়ালু এবং রহিম দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, তিনি মুমিন বান্দাদের জন্য বেশিই দয়াবান।

সূরা বাকারাহর তাৎপর্য ও শানে নুযুল:

মুফাসসিরগণ বলেন, যখন কোনো একটা সূরার তাফসির শুরু করবেন, শুরুতেই নবী কারীম (সঃ) কি বলেছেন, সাহাবীগণ (রাঃ) কি বলেছেন, সূরার কি ফজিলত বর্ণনা করেছেন তা আলোচনা করতে হবে।

ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, “এটি মাদানী সূরা অর্থাৎ মদীনাতে নাযিল হয়েছিল। এটি

মদীনায় নাযিল হওয়া প্রথম সূরা। শুধুমাত্র একটি আয়াত বাদে যেটি মাদানী নয় অর্থাৎ মক্কায় নাযিল হয়েছে। পরবর্তীতে যখন সূরাটির আয়াতগুলো সন্নিবেশিত করা হয় অর্থাৎ তারতীব (সাজানো) হচ্ছিল তখন দেখা যায়, এর একটি আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছিল। এই আয়াতটি হিজরতের পর নাযিল হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা মক্কায় বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়। এই আয়াতটি একই সাথে মাদানী বা মাক্কী বলা যায়। সময়ের দিক দিয়ে মাদানী অর্থাৎ হিজরতের পর নাযিল হয়েছে, আর স্থানের দিক দিয়ে মাক্কী অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানকালে নাযিল হয়েছে।

বিশিষ্ট তাবেঈ ইকরামা (রঃ) বলেন, “মদীনাতে সর্বপ্রথম সূরা বাকারাহ নাযিল হয়”। সূরা বাকারার ফজিলত অন্যান্য সূরার চেয়ে বেশি। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযি, ইমাম আহমদ তাদের বয়ানে বলেন, “নবী কারিম সঃ বলেছেন, কিয়ামতের দিন কুরআনকে ও কুরআনের পরিবারকে উপস্থিত করা হবে, যারা পৃথিবীতে কুরআনকে আমল করত। তখন সবার আগে রাখা হবে যারা সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করত তাঁদেরকে।

এক সাহাবী (রাঃ) বলেছেন, রাসূল (সঃ) এই সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানের জন্য আমাদের সামনে ৩টি উদাহরণ পেশ করেছেন।

• এই সূরা দুটি তাদের পাঠকারীকে কিয়ামতের দিন মেঘের ঠত হয়ে বেষ্টন করে নেবে অর্থাৎ কিয়ামতের বিপদ হতে তাদেরকে মেঘের ঠত ঘেরাও করে রক্ষা করবে।

• এই সূরা দুটি পাখির দল হয়ে তার পাঠকারীদের চারপাশে ঘুরতে থাকবে। পুলসিরাতে সময় তাদের সঙ্গ দেবে যেভাবে একদল সেনা সেনাপতিকে পাহারা দেয়।

• অন্য হাদিসে রাসূল সঃ বলেছেন, “তোমরা সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান পাঠ কর। কেননা তারা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য কুসুমাস্তির্গ ফুল হয়ে ফুটবে।”

সূরা বাকারার আরো অনেক ফজিলত আছে। এর মধ্যে একটি মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেন, “রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে না, কেননা যে ঘরে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত হয় সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে।”

অন্য হাদিসে রাসূল সঃ বলেছেন, “প্রতিটি জিনিসের এক একটি কুজ (চূড়া) আছে। এবং আল কুরআনের চূড়া হলো সূরা বাকারাহ। যে এটি দিনে পাঠ করবে ৩ দিন পর্যন্ত শয়তান তার ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যে এটি রাতে তিলাওয়াত করবে ৩ রাত শয়তান সেই ঘরে যাবে না।”

হাদিসে রাসূল সঃ বলেছেন, “সূরা বাকারাহর প্রত্যেকটি আয়াতের সাথে ৮০ জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছেন।”

এত মূল্যবান ও এত ভারী একটি সূরা যার জন্য প্রত্যেকটি আয়াতের সাথে ৮০ জন ফেরেশতা বা পাহারাদার ছিল। এবং রাসূল সঃ বলেন, “এই সূরার ভেতরে একটি আয়াত (আয়াতুল কুরসি) আছে যা আল্লাহ তা’আলার আরশের তলদেশ থেকে উদ্গত হয়েছে।

একটি হাদিসে রাসূল সঃ কে প্রশ্ন করা হয়, কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে দামী সূরা কোনটি? তিনি বলেন, যে সূরায় “বাকারাহ” তথা গাভীর বর্ণনা এসেছে সেটি। অর্থাৎ সূরা বাকারাহ। আবার প্রশ্ন করা হয়, এই সূরার মধ্যে কোন আয়াত সবচেয়ে দামী। উত্তরে রাসূল সঃ বলেন, আয়াতুল কুরসি ও বাকারাহর শেষ দুটি আয়াত। কেননা এরা আল্লাহ সুবাহানাছ তা’আলার আরশের তলদেশ থেকে উতপত্তি হয়েছে।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, সাহাবী উসাইদ ইবনে হুদাইর রাঃ বলেন, তিনি একবার রাতে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করছিলেন, তখন বাইরে রাখা একটা ঘোড়া অনেক উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল। এই দেখে তিনি থামলেন। একটু পরে আবার পড়া চালু করলে আবার ঘোড়া উত্তেজিত হচ্ছিল। এভাবে যখনই পড়া শুরু করতেন তখনই ঘোড়া উত্তেজিত হয় এবং থামলে ঘোড়া চুপ থাকে। এই দেখে তিনি ভীত হয়ে তার পাশের ঘরে থাকা তার ছেলে ইয়াহইয়াকে বলেন। তার ছেলে ইয়াহইয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে দেখা গেল, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে এবং মাঝে মাঝে আলোর ঝলক দেখা যাচ্ছিল যা বাতির মত উজ্জ্বল। সকাল হলে তারা রাসূল সঃ এর কাছে এ ঘটনা বলেন। তখন রাসূল সঃ বললেন, “তুমি কি জানো সেটা কি ছিল? তারা বলল না! নবিজী বললেন, এরা হলো সেই ফেরেশতারা যারা তোমার তিলাওয়াত শুনতে নিচে নেমে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে তবে তারাও সকাল পর্যন্ত অবস্থান করত এবং সকল মানুষ এদেরকে মেঘের ভেতর আলোর বাতির মতই দেখতে পেত”। এই হাদিসটি ইমাম বুখারীও রহঃ বর্ণনা করেন।

আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, রাসূল সঃ একবার একটি অভিযানে কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করছিলেন। তখন তিনি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করছিলেন কে কোন কোন সূরা জানে। তখন একদম কম বয়সী একজন ছেলে আসলে তাকে নবিজী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন সূরাটি আছে? জবাবে সে বলল, আমি এই এই সূরা জানি। রাসূল সঃ বললেন, তুমি সূরা বাকারাহ জানো! সে বলল, হ্যাঁ, আমি সূরা বাকারাহ জানি। তখন রাসূল সঃ তাকে সেই দলের আমির বানিয়ে দিলেন। অর্থাৎ যে সূরা বাকারাহ জানে তার ভেতরে নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে উঠে।

উসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, “রাসূল সঃ একবার সাকিফ গোত্রের কাছে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন যার আমির আমাকে বানিয়েছিলেন। তার কারন আমি নিয়মিত সূরা বাকারাহ পাঠ করতাম। রাসূলুল্লাহ সঃ থেকে একটা চমৎকার হাদিস আছে। আমরা জানি কুরআনের হাফেজকে জান্নাতী নূরের তাজ মুকুট পরানো

হবে এবং তার মা-বাবাকেও।

আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসূল সঃ বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করে জান্নাতে তাকে নূরের মুকুট পরানো হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হাফেজ না হলেও সকলের জন্য সুযোগ আছে জান্নাতে নূরের মুকুট পাওয়ার, যদি নিয়মিত সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা যায়। জারির ইবনে ইয়াজিদ রাঃ বলেন, “মদিনার কিছু মুরাব্বির রাসূল সঃ এর পক্ষ থেকে একটি ঘটনা বলল। তারা রাসূলকে সঃ একবার বললেন, আপনি কি সাবিত ইবনে কাইস ইবনে সামনাসের ঘর দেখেছেন, প্রত্যেক রাতে তার ঘর নক্ষত্রের মতো আলোকিত হয়ে যায়। রাসূলকে সঃ বলা হলে তিনি বলেন, “তাহলে সে নিয়মিত সূরা বাকারাহ পড়ে। সাবিতকে পরে জিজ্ঞেস করা হলে সে হ্যা সূচক সম্মতি দেয়। হুয়াইফা রাঃ থেকে বর্ণিত, “তিনি বলেন যে, আমি রাসূলকে সঃ দেখলাম রমাদানের রাত্রিতে নামায পড়ছিলেন। আমিও সাথে ছিলাম। তিনি প্রথমে সূরা বাকারাহ দিয়ে শুরু করলেন, তারপর সূরা নিসা পড়লেন, এরপর ২য় রাকাতে আলে ইমরান পড়ে সালাম ফিরালেন।

তাহলে দেখা যায়, রাসূল সঃ এক রাকাতেই পুরো সূরা বাকারাহ শেষ করতেন।
(সুবাহানালাহ)

বর্তমানে এটা অসম্ভব মনে হতে পারে। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ফেসবুক, টুইটার দেখলেও ক্লান্ত হই না কিন্তু ইবাদাতে এত সময় দিতেই চাই না। তেমনি কেউ তার পছন্দের সূরা নিয়ে সারাদিন তিলাওয়াত ও নামাযে কিরাত করলেও তাতে ক্লান্ত হয় না, বিরক্তি আসে না। কারণ এটাতেই তাঁর অন্তর স্বাদ পায়।

সূরা বাকারার শুরুতে আছে “আলিফ লাম মীম”। ইমাম কুরতুবী রহঃ, সুফিয়ান আস-সাওরী রহঃ সহ আরো অনেক সালাফগণ বলেন, এই শব্দগুলো কুরআনের রহস্য। আল কুরআনসহ আল্লাহ প্রদত্ত যত আসমানী কিতাব আছে, তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলসহ সবগুলোতেই তিনি রহস্যের এরকম চাবিকাঠি দিয়ে রেখেছেন। আবু বকর রাঃ, উমার রাঃ, উসমান রাঃ, আলি রাঃ, ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত আছে, এই সূরার শুরুতে এসকল হরফ হলো বিচ্ছিন্ন হরফ বা হরফে মুকত্বয়াহ। এগুলোর কোনো তাফসির হতে পারে না। সুতরাং আমরা প্রত্যেক সূরায় যেসকল বিচ্ছিন্ন হরফ দেখি তার তাফসির একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তারপরেও দেখা যায়, অনেকে এসকল হরফের তাফসির করেন যা অনুচিত। এই সকল হরফের তাফসিরের ক্ষেত্রে নিজের মনগড়া কোনো কথা বলতে আল্লাহ ও তার রাসূল সঃ নিষেধ করেছেন। নিজের মনের মত এসব হরফের তাফসির করা অনেক খারাপ কাজ। রাসূল সঃ বলেছেন, “কুরআনে এমন অনেক শব্দ বা হরফ আছে যেগুলোর মাহাত্ম একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। যারা এগুলোর পেছনে লাগে তারা পথভ্রষ্ট”।

যেহেতু আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা আসেনি তাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহ ও রাসূল সঃ এ বিষয়ে যা বলেছেন সে অনুযায়ী কাজ করা ।

রাসূল সঃ এ সম্পর্কে একটি হাদিস শুধু বলেছেন, “তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে সে একটি নেকী পাবে আর এর সাথে আরো ১০টি নেকী যোগ হবে। আমি বলছিনা যে আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর ও মীম একটি হরফ বা অক্ষর।

সাহাবীদের রাঃ মধ্যেও কেউ এসব হরফের তাফসির করেন নি। অনেকেই করেছেন কিন্তু এর সুস্পষ্ট কোনো দলিল নাই।

২য় আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন, “যালিকাল কিতাবু লা রইবা ফিহি...” অর্থাৎ, এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকীদে জন্য পথ প্রদর্শক।

এখানে যালিকা অর্থ- ওই, সেই। “যালিকাল কিতাব” অর্থ ওই কিতাব (যেটা সামনে বর্ণনা করা হবে)। আমরা যেমন বলি আপনি তো সেই মানুষ, যাকে আমরা বিশ্বাস করি। এটা তো সেই জিনিস যা আপনি বাসায় রেখে এসেছেন। এখানে সেই কথাটা দিয়ে আমরা দূরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে বুঝায়। এখানেও ঠিক একইভাবে আল্লাহ তা’আলা “যালিকাল কিতাব” বলেছেন। কিন্তু এটা আরবি ব্যাকরণগতভাবে বললে হত “হাযাল কিতাব” অর্থাৎ “এই কিতাবটি”। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা এখানে খুব চমৎকারভাবে একটি রহস্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তা হলো, “যালিকাল কিতাব” বা এটি সেই কিতাব যেটি বা যার মূললিপি সেই দূরের সপ্ত আসমানের উপর লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। আর এর প্রতিলিপি হল যেটা আমাদের সামনে এখন উপস্থিত।

এরপরের আয়াত, “লা রইবাফিহ-হুদাল্লিল মুত্তাকিন” অর্থাৎ, এটি নিঃসন্দেহ কিতাব”- এটি সেই গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে সাহাবীদের পক্ষ থেকে তাফসীর আছে, সন্দেহ বলতে কী বোঝানো হয়েছে।? অনেকে বলছেন, “যালিকাল কিতাব” বলার উদ্দেশ্য হলো, সেটা আল্লাহ তা’আলার ইলমের মধ্যে আগে থেকেই আছে অথবা শুরুতে যে আলিফ-লাম-মীম বলেছেন সেটা উদ্দেশ্য। মূলত এখানে আলিফ-লাম-মীম হরফগুলো শুরুতে আনার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আরব জাতিকে চ্যালেঞ্জ জানানো যে তোমাদের ভাষা থেকে আমি এমন কিছু অক্ষর দিয়েছি যার অর্থ তোমরা বের করতে পারছো না এবং পারবেও না।

আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টির শুরু থেকেই মানজাতিকে সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি চাইলে সবাইকে এমননি এমননি পাঠিয়ে দিতে পারতেন। তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। কিন্তু আল্লাহ যদি তেমন করতেন তবে দেখা যেত বর্তমানে মুশরিকরা

যে অবস্থানে আছে, একেকজন যে যাকে পাচ্ছে পূজা করছে, উপাসনা করছে, এমন একটি ঘটনা ঘটত, পৃথিবীতে খুবই বিশৃঙ্খলা হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ তিনি প্রত্যেকটি যুগে প্রতিটি জাতির জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন, সংবিধান-কিতাব পাঠিয়েছেন। এ কারণে কিতাব প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানজাতির জন্য দয়া। সেই বিবেচনায় আমরা বলতে পারি, এ দয়াটির কথায় আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহায় বলেছেন, “আহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহীম” অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু”।

কেন দয়াময় কেন দয়ালু? সেগুলোর কথা সূরা বাকারায় আসলো। তিনি মানবজাতির জন্য প্রতিটি ধাপে কিতাব দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে শিখায় গুহা মানবের মাধ্যমে পৃথিবী শুরু হয়েছিল। প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, একের পর এক যুগ। এভাবে বর্তমানে বিজ্ঞান তার উন্নতি সাধন করেছে। এগুলো আসলে ভুয়া মতবাদ। যদি সৃষ্টির শুরু থেকে এমন ঘটনা হত তাহলে শুরুতেই আল্লাহ নবীদেরকে পাঠাতেন না। শুরু থেকেই উনাদের যে কারণে পাঠানো হয়েছে তা হলো তাওহীদ। তাওহীদ হলো সবকিছুর চূড়ান্ত ফলাফল। বিজ্ঞান যদি পৌছাতে পৌছাতে কখনো শেষ প্রান্তে পৌছায় তখন যেটা পাবে সেটাও হবে তাওহীদ / আল্লাহর একত্ববাদ।

আমরা যে বলি সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। আসলে এগুলো ধোকাবাজি। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি আমাদের চেয়ে আমাদের পূর্ববর্তীরা নিচু জাতি ছিল তাহলে আমাদের উন্নত প্রমাণ করতে পারব। এ কারণে আমরা বলে থাকি যে, পূর্ববর্তীরা কিছু জানত না, এরা গুহায় থাকত। এরপর আমরা উন্নতি করতে করতে এই পর্যায়ে এসেছি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও তাই বলবে যে আজকের আমরা অতটা উন্নত ছিলাম না যতটা তারা করবে সামনে। আসলে প্রত্যেকটি প্রজন্ম তার নিজের যুগেই সর্ব উন্নত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “যে জাতিগুলো চলে গেছে তারা যা কামাই করেছে তাই পাবে এবং তোমাদের জন্য তোমরা যা কামাই করেছো তাই পাবে।”

এখানে তুলনা করে কে কার চেয়ে বেশি উন্নতির চূড়ায় পৌছেছে তার বাছ বিচার করার প্রয়োজন নেই। কারণ সর্বুন্নত যে বিষয়টি সেটি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শুরুতে আদম আঃ এর মাধ্যমে দিয়ে রেখেছেন, সেটি হচ্ছে ইসলাম, তাওহীদ, আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর আঙ্গিন, খেলাফত ইত্যাদি।

আমরা কুরআনের যে ধারাবাহিক আলোচনা, সেখান থেকেই জানি যে, আদম আঃ পোশাক নিয়েই দুনিয়াতে আগমন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “হে বনী আদম, তোমাদেরকে আমি পোশাক দিয়েছি”,

শুধুমাত্র পোশাক না তার সাথে শোভাবর্ধনকারী পোশাক যা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান বলে আদি মানুষ গুহায় বাস করত কাপড় ছাড়াই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আদম আঃ কে পোশাক সহ দুনিয়াতে ঘর নির্মাণ করার আদেশ দিয়েই প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নিয়ামত যে তিনি শুরু থেকেই তার একত্ববাদ তথা তাওহীদের বাণী প্রচারে নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। কিতাব পাঠিয়েছেন। এ কারনেই এটি আমরা সূরা ফাতিহায় যে পড়েছি- “তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু” তার একটি উদাহরণ তিনি এই সূরা বাকারায় দিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য কিতাব -সংবিধান পাঠিয়েছেন। কিভাবে আমরা তার ইবাদাত করব, সঠিক পথে চলব, কিভাবে আমরা তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস উন্নত করব এগুলো তিনি কিতাব বা আল কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই”, এর দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে এর মধ্যে কোনো বিরোধপূর্ণ কথা নাই।

“হুদাঞ্জিল মুত্তাকিন” অর্থাৎ এই গ্রন্থটি মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। “হুদা” অর্থ হেদায়াত স্বরূপ। আরবি ভাষার একজন বড় আলেম জামাল শরীফ রহঃ বলেন, হেদায়াতের মানে দুইটি। এক- হলো পথ দেখিয়ে দেয়া। যেমন, আপনাকে একজন বললো যে, আমাকে মতিঝিল যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিন। আপনি তাকে মতিঝিলে যাওয়ার একটা বাসে উঠিয়ে দিলেন। এটা এক ধরনের হেদায়াত বা পথ প্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “প্রত্যেকটি জাতির জন্য আমি হেদায়াত দেখিয়ে দেয়ার জন্য নবী (পথ প্রদর্শক) পাঠিয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আপনি সঠিক সরল পথ দেখিয়ে দিতে পারেন”।

আরেকটি প্রকার হলো একেবারে গম্ভ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া। আপনাকে কেউ বললো, “আমি কিভাবে মতিঝিল যেতে পারি”? আপনি তাকে সাথে করে নিয়ে মতিঝিল গেলেন এবং বললেন এটাই মতিঝিল। এই প্রকার হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে। এই কারনে রাসূল সঃ তার নিজের চাচাকে ইমান আনার জন্য অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পারেননি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আপনি কাউকে পছন্দ করলেই তাকে হেদায়াত দিতে পারবেন, পৌঁছে দিতে পারবেন- তা কিন্তু না।”

হেদায়াতের তৌফিক আল্লাহর হাতে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, “ওই সকল মুত্তাকিরা আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর আছে।” এই যে হেদায়াত তা হচ্ছে দুই প্রকার। সিরাতুল মুসতাকিমের পথ দেখিয়ে দেয়া। আরেকটি হচ্ছে একেবারে পথে পৌঁছিয়ে

দেয়া যা আল্লাহর হাতে।

মুক্তাকী বলা হয় যাদের মধ্যে তাকওয়া রয়েছে। শাব্দিক অর্থ হলো- কম কথা বলা। যারা স্বল্পভাষী যারা নিজেদের সুরক্ষা করে, অদ্ভুত বা উদ্ভট কথা বলা থেকে নিজেকে রক্ষা করে তারাই মুত্তাকী।

পারিভাষিকভাবে, যে ব্যক্তি ঐ সকল বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করে যেগুলো করলে শাস্তি আছে। মুত্তাকী হচ্ছে তারা যারা জাহান্নামের শাস্তি হতে, আল্লাহর রাগ, ক্রোধ হতে, দুনিয়াবি শাস্তি হতে, গজব হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

ইবনে জারিরের রহঃ বর্ণনায় ও মুসতাদারাকে হাকিমে এসেছে, “ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, “যালিকাল কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য আল কুরআন এবং হুদাল্লিল মুত্তাকিন দ্বারা উদ্দেশ্য হল- আল কুরআন মুত্তাকীদের জন্য আলোকবর্তিকা।“ অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাকে শাস্তির ভয় করে তারাই মুত্তাকী। রাসূল সঃ বলেছেন, “একজন বান্দা ততক্ষন পর্যন্ত মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত না সে কোনো একটি ক্ষতিতে পড়ার ভয়ে ক্ষতি নাই এমন কিছু থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখে”।

পেপসি, কোকাকোলা এগুল হারাম হতে পারে, নাও পারে। হতে পারে বা হারাম হওয়ার অবকাশ আছে এমন সন্দেহ থাকার কারণে তা থেকে বেচে থাকা হলো তাকওয়া। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরকম। কোনো এলাকায় এমন একটি আসর বা জায়গা আছে যেখানে মদ ও জুয়ার আড্ডা বসে প্রতিদিন। ঐ আসর পেরিয়ে মসজিদে যাওয়া লাগে। তো কেউ যদি এই ভয় করে যে, যদি এই পথে মসজিদে যাওয়ার সময় কেউ মনে করে নেয় যে সে ঐ মদের আড্ডা থেকে এসেছে এবং সে ঐ পথ ত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়ে অন্য পথ ধরে মসজিদে যায় তাহলে সে মুত্তাকী।

হতে পারে যে ইসলামি ব্যাংক যে মুনাফা দেয় তা সুদ না। তবুও আমি যে টাকা মুনাফা পেলাম তা নিলাম না বা কাউকে তা দান করে দিলাম কোনো সওয়াবের আশা না করেই এই ভয়ে যে, এসব সুদের অন্তর্ভুক্ত হলেও হতে পারে। এই কাজ তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত আর যে ব্যক্তি এমন করবে সে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এরপরের আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, “যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে”

“যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে” এর মানে হলো বিশ্বাস করা। এখানে আল্লাহ বলছেন, না দেখেই অদৃশ্যে বিশ্বাস করা। এই অদৃশ্যে বিশ্বাস এর উদ্দেশ্য কি? কেউ কেউ বলেছেন যে, এই অদৃশ্য হচ্ছে আল্লাহ, কেউ কেউ বলেন, অদৃশ্য মানে তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালা, কেউ বলেছেন, অতীতে নাযিলকৃত কিতাব, নবী রাসূলের উপর বিশ্বাস, কেউ

কেউ বলেছেন, কিয়ামতের আলামত, কবরের আযাব, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর, পুলসিরাত, মিজান। আদতে এ সব কিছুই গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। এগুলতে যারা বিশ্বাস করবে তারাই মুত্তাকী। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের পরিচয় দিচ্ছেন যারা গায়েবে বিশ্বাস করে যদিও তারা তা দেখে না।

রাসূল সঃ কে একবার বলা হলো, আপনি আমাদের ইমানের সম্পর্কে বলেন। তিনি বললেন, “ইমান হলো আল্লাহর উপর বিশ্বাস, তার ফেরেস্টাগণ, তার কিতাবাদির উপর বিশ্বাস, তার রাসূল, আখিরাত ও তাকদীরের ভালো মন্দের ওপর বিশ্বাস করা।” তাহলে এই ৬ টি রুকুন হলো ইমানের মূল যা এই আয়াতগুলোতে উঠে এসেছে। এর কোন একটিতে অবিশ্বাস করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ একবার রাসূল সঃ কে বললেন, “পরিপূর্ণ ইমানদার ব্যক্তি কারা, আমাকে বলুন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ!” তখন রাসূল সঃ কিছু বললেন না। তখন পাশ থেকে সাহাবীরা বলল, “তারা তো হচ্ছে ফেরেস্টারা। তারাই পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী।” তখন রাসূল সাঃ বললেন, “না এটা তো তাদের উপর বাধ্যতামূলক কাজ যে তারা একমাত্র আল্লাহর উপর ইমান আনবে”। তখন সাহাবীরা বললেন যে, “তাহলে শহীদরা সবচেয়ে পূর্ণ ইমানের অধিকারী।” তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, “না না না! তারা তো এমন যে আল্লাহ তাদের শহীদের মর্যাদা দিয়েই সম্মানিত করেছেন।” সাহাবীরা তখন প্রশ্ন করলেন, “তাহলে কারা পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী?” তখন রাসূল সঃ বললেন, “তারা হচ্ছে সেই মানুষগুলো যারা এখানো তাদের পিতামাতার মেরুদণ্ডে অবস্থান করছে যারা আমার পরে আসবে এবং আমার প্রতিটি কথাকে বিশ্বাস করবে কিন্তু আমাকে দেখবে না। তারা কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো খুলে কথাগুলো বিশ্বাস করবে এবং সেগুলো বিশ্বাস করবে আমাকে না দেখেই। তারা হচ্ছে পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী।”

রাসূল সঃ তখন থেকেই জানতেন কুরআন শরিফ একদিন সকলের হাতে হাতে পৌঁছে যাবে, সবাই এটা পাঠ করবে। আমরা যারা তাঁকে না দেখেই তাঁর উপর ইমান এনেছি, এই কথার সত্যায়ন করেছেন এই হাদিসে। তাহলে আমরা যদি সেরকমভাবে পরিপূর্ণ ইমান আনতে পারি তবে রাসূল সঃ যাদেরকে উদ্দেশ্য করে উক্ত হাদিস বলেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

তো যারা এসমস্ত গায়েবের উপর ইমান আনে তাদের আরেকটি দায়িত্ব এসে যায়, তা হলো আল্লাহকে ভয় করা, তার কথাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “তারা সালাত কায়েম করে” অর্থাৎ সালাত প্রতিষ্ঠা করে (সালাতের রুকুন, সুন্নত, ফরজ, ওয়াজিব, আদব ওয়াজ্ত সবকিছু লক্ষ্য রেখে নামায আদায় করা)।

রাসূল সঃ কে একবার বলা হলো, “অনেকে শেষ ওয়াজ্তে নামায পড়ে। তখন তিনি

বললেন, এটা হলো মুনাফিকের নামায। যারা প্রথম ওয়াঙ্কে নামায আদায় করে তারা প্রকৃত মুত্তাকী। কেননা আল্লাহ বলেছেন, “যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।”

এখানে একটি বিষয় হচ্ছে রিজিক। এর অর্থ সম্পর্কে ওয়ালামায়ে কেলাম বলেন, রিজিক হলো ঐ সকল জিনিস যেগুলো থেকে সে উপকৃত হতে পারে। সেটা সম্পদ হতে পারে, সময়, শক্তি, শ্রম, সহচর্য, সম্পর্ক হতে পারে। প্রত্যেক জিনিসই আসলে রিজিক, আমাদের প্রতিটি বিষয়ে যে ইলম তাও রিজিক। ইমাম সুযুতী রঃ বলেন, রিজিক দুই প্রকার। প্রকাশ্য ও প্রকাশ্য। প্রকাশ্য রিজিক যা আমরা চোখে দেখি। হায়াত, খাওয়া দাওয়া, পানি, সম্পদ। আরেকটা হচ্ছে বাতিনি/অদৃশ্য/অপ্রকাশ্য রিজিক যাকে ইলম বলে। যে ব্যক্তির প্রকাশ্য রিজিক বেড়ে যাবে তার অপ্রকাশ্য রিজিক কমে যাবে। আর যার প্রকাশ্য রিজিক কমে যাবে তার অপ্রকাশ্য রিজিক তথা ইলম আল্লাহ বাড়িয়ে দেন। এছাড়াও রিজিক হালাল-হারামও হতে পারে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, “তারা রিজিকপ্রাপ্ত জিনিস হতে খরচ করে”। মুফাসসিরগণ বলেন, “ইলম যেহেতু একটা রিজিক তাহলে আলেমদের উচিত আল্লাহ তাদের যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে দেন দান করা, অর্থাৎ অন্যকে ইলম বিতরণ করা। আবার আরেকটি অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাদের যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করা। গরীব-দুগ্ধি, অনাথ-অসহায়, পরিবার -পরিজন সকলের জন্য আর্থিক দান করা, যাকাত আদায় করা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য। তাহলে উক্ত আয়াতে আমরা মুত্তাকীদের ৩টি বৈশিষ্ট্য পেলাম, “যারা ইমান আনে অদৃশ্যের উপর, যারা সালাত কায়েম করে, যারা আল্লাহর জন্য খরচ করে”। আল্লাম বোয়ালভী রহঃ খুব সুন্দর তরজমা করতেন এই আয়াতের। তিনি বলতেন, “মুত্তাকী হলো তারা যার অন্তর মুমিন হয়েছে, যার দেহ মুমিন হয়েছে এবং যার সম্পদ মুমিন হয়েছে”। অর্থাৎ প্রথমত যারা অদৃশ্যে ইমান আনলো তার অন্তর মুমিন হল, যারা সালাত কায়েম করল তাদের দেহ মুমিন হল এবং যারা আল্লাহর পথে খরচ করে তার সম্পদও মুমিন হল।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন “যারা ইমান আনে আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তী নবিগণের উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার উপর আর পরকালের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে।” অর্থাৎ, প্রকৃত মুত্তাকী তারাই যারা রাসূল সঃ এর উপর নাযিলকৃত কিতাব আল কুরআনের উপর ইমান আনে, যারা পূর্ববর্তীদের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলের উপর ইমান আনে এবং পরকালের উপর যারা দৃঢ় আস্থা রাখে। এখান থেকে এটা স্পষ্ট হলো, শুধুমাত্র নামায, সাদকা করলেই মুত্তাকী হওয়া যায় না। এর সাথে সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ ও আল কুরআন ও আখেরাতে যা যা ঘটবে তার উপরেও দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে। মূলত এই কয়েকটি আয়াতের ভেতরে ইমানের প্রতিটি স্তর চলে আসে। আল্লাহর প্রতি ইমান, তার রাসূল, তার ফেরেস্টা, তাঁর কিতাব, সালাত,

যাকাত, আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি ইমান- এই সবগুলিই এসকল আয়াতের মর্মকথা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা এই মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য বলার পর তাদের পরিণতি, তাদের ফলাফল, তাদের রেজাল্ট সম্পর্কে বলেছেন, “উলা ইকা আ'লা হুদাম্মির-রব্বিহীম, ওয়া উলা ইকা হুমুল মুফলিহ্ন।” এটা মূলত একটা প্রশ্নের উত্তর। আর প্রশ্নটি হলো, “এই যে মানুষগুলো আল্লাহ, তার রাসূল, তার ফেরেস্তা, তার কিতাব, আখিরাত, তাকদীর এর প্রতি ইমান এনেছে, সালাত কায়েম করেছে, যাকাত প্রদান করেছে তাদের পরিণতি কি? আল্লাহ তা'আলা বলছেন, “এই মানুষগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর আছে এবং এরাই সফলকাম, তারাই বিজয়ী, তারাই সাফল্যের অধিকারী”।

প্রথমে যে বলা হয়েছে, “হুদাল্লিল মুত্তাকীন” বা এই কিতাবটি মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক। সেখানে দুটি বিষয় ছিল। একটি হেদায়াতের মর্মার্থ ছিল যে আল কুরআন মানুষকে শুধু হেদায়াতের পথই দেখিয়ে দিতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহর। কিন্তু তা কিসের ভিত্তিতে? যারা ইমান এনেছে, সালাত আদায় করেছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে আদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, “এই মানুষগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর আছে এবং এরাই সফলকাম, তারাই বিজয়ী, তারাই সাফল্যের অধিকারী”।

এখানে “মুফলিহ্ন” বলতে মহাসাফল্য বা শেষ গন্তব্য বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ লোকটি তার মূল গন্তব্য জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, “যে ব্যক্তি সূরা বাকারাহর প্রথম ৪ টি আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও তার পরবর্তী আয়াত এবং বাকারাহর শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করল সেদিন শয়তান তার ধারে কাছেও আসবে না। এই আয়াতগুলো পাগলের উপরে ইমানের সহিত পড়লে আল্লাহর রহমতে পাগল সুস্থ হয়ে যায় এবং তিলাওয়াতকারীর পরিবারের উপরও কোন শয়তান বদ আসর ফেলতে পারবে না।”

এখানে আসলে ইয়াকিনের কথা। যে ব্যক্তি ইয়াকিনের সাথে আমল করবে সে যথাযথ ফলাফল অবশ্যই পাবে।



মৃত্যুর সমাপ্তি

মূল : শায়খ ইবনু নাসির

অনুবাদ : নিয়াজ আম্বুদ খান

সুবূহৎ অটালিকায় আপনি আপনার পরিবারের সাথে জান্নাতের পানীয় এবং ফলমূল উপভোগ করছেন, আপনার পরিবারের সাথে কথা বলছেন। তখন আপনি একটি ঘোষণা শুনতে পাবেন, সিটি সেন্টার বা ডাউনটাউন, সহজ কথায় আমরা যাকে ‘বড় মার্কেট’ বলি তাতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তাই আপনি এবং আপনার পরিবারের সবাই ছুটে যাবেন এবং দেখতে পাবেন যে সমস্ত জান্নাতবাসী এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। শুধু আপনারাই জান্নাতে একত্রিত হবেন না, আপনি আরও দেখতে পাবেন যে জাহান্নামীদের সকলকেও জাহান্নামের এক জায়গায় একত্র করা হবে। এবং সেই এলাকায় জান্নাত এবং জাহান্নাম পৃথক করা। ফেরেশতারা তাদের সাথে ‘মৃত্যু’ নিয়ে আসবে মেঘের রূপে।

মৃত্যু দৈহিক আকারে আসবে, সকলেই চিনতে পারবে এটাই মৃত্যু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেকেই তাদের ঘাড় উচু করে রাখবে। এটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ এবং বিস্ময়কর মুহূর্ত। তাই তারা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখছে। মৃত্যুকে বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে নিয়ে আসা হবে। এবং তারপর ফেরেশতারা একটি ছুরি নেবে এবং তারা মৃত্যুকে জবাই করে ফেলবে। তারা মৃত্যুকে হত্যা করবে। মানে মৃত্যুর অস্তিত্ব হরণ করে ফেলা হবে। তারপর তারা ঘোষণা করবে এবং বলবে : “হে জান্নাতবাসী, তোমরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে আর কোনো মৃত্যু নেই। এবং হে জাহান্নামী লোকেরা, জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে আর কোন মৃত্যু নেই।” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি এমন কোন উত্তেজনার মুহূর্ত থাকে যা একজন ব্যক্তিকে এতো আনন্দিত করে যে সে মারা যাবে, তবে তা সেই মুহূর্তটি জান্নাতবাসীদের জন্য হবে। আর যদি দুঃখ এবং হতাশার এমন মুহূর্ত থাকে যা একজন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটাতে পারে, তবে তা জাহান্নামীদের জন্য সেই মুহূর্তটি হবে। এটাই হবে জান্নাতবাসীদের জন্য শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এবং জাহান্নামীদের জন্য সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত।



সেই মানুষটার গল্প বলি..

আসিফ আদনান

সেই মানুষটার গল্প বলি। হয়তো বা আগে শুনেছেন, তবুও আবার বলি। সেই দিনের কথা বলি যা এখনো আসেনি, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই আসবে। সেই সময়টার কথা বলি, যা আপনি ভুলে গেছেন। কিন্তু অবধারিতভাবে যা আপনাকে গ্রাস করবে।

পুনরুত্থানের দিন। জড়ো করা হয়েছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের। মানবজাতি অসহায়, সন্ত্রস্ত, অপেক্ষমান। চিন্তিত, অস্থির, অক্ষম। সেইদিন মানুষ তাদের কষ্ট লাঘব করার আর্জি নিয়ে দুনিয়ার রাজাদের কাছে যাবে না। দুনিয়ার শাসকদের কাছে যাবে না। তারা ছুটে যাবে আল-আম্বিয়ার (নবিদের) কাছে – আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

মানুষ প্রথম ছুটে যাবে মানবজাতির পিতা আদমের কাছে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আদম আলাইহিস সালাম-এর কাছে গিয়ে বলবে -

‘হে আদম, আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখছেন না? অথচ আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশতাগণ দিয়ে সিজদাহ করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। কাজেই আপনি আমাদের রবের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এ স্থান থেকে আমাদেরকে তিনি স্বস্তি দেন।’

আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলবেন - এ কাজের জন্য আমি উপযুক্ত নই। আমাদের পিতা আদম নিজের ভুলের কথা স্মরণ করবেন এবং মানুষকে বলবেন মানবজাতির প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল নূহ-এর কাছে যেতে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তারা নূহ আলাইহিস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ

কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর কৃত ভুলের কথা স্মরণ করবেন, এবং মানুষকে বলবেন আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের কাছে যেতে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা উল্লেখ করে বলবেন- আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মূসার কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলেছিলেন।

তারা তখন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি নিজের ভুলের কথা উল্লেখ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং ঈসার কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, কালিমা ও রূহ। আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তখন তারা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা, যার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা - আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। তাঁরা কেউ সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। প্রত্যেক নবি নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন।

তারপর সবাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাবে। তিনি তাঁর রবের কাছে অনুমতি চাইবেন এবং তাঁকে অনুমতি দেয়া হবে। তিনি তাঁর রবের সামনে সিজদাহবনত হবেন। আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, বিচারদিনের মালিক আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা যতক্ষণ ইচ্ছে করবেন ততক্ষণ মুহাম্মাদ ﷺ সেই অবস্থায় থাকবেন।

তারপর তাঁকে ﷺ বলা হবে,

হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে।

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসার দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবেন এবং বলবেন, 'উম্মাতি, উম্মাতি (আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ)'

সমগ্র মানবজাতি, এমনকি নবিগণ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম নিজ নিজ অবস্থা

নিয়ে সন্ত্রস্থ থাকবেন। সবাই নাফসি, নাফসি করতে থাকবেন। মুহাম্মাদ ﷺ বলবেন,
আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ!
(বুখারি, 7510; মুসলিম, 19)

এই সেই মানুষ যার সুন্যাহকে আজ আমরা তুচ্ছ করছি। সেই মানুষ যার অপমান,
অবমাননা আমরা নির্বিকারভাবে সয়ে যাচ্ছি। যার অবমাননাকারীদের আমরা নির্বিঘ্নে
আগ্রাসন চালিয়ে যেতে দিচ্ছি।

সেই মানুষটা, যিনি গভীর রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা চিন্তা করে কাঁদতেন।
যিনি বারবার আল্লাহর কাছে তাঁর উম্মাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

সেই মানুষটা যিনি আমাদের দেখেননি, কিন্তু আমাদের জন্য বারবার চিন্তিত হয়েছেন,
কান্না করেছেন, দুআ করেছেন।

সেই মানুষটা, যিনি সুপারিশ করবেন, সেই ভয়ঙ্কর দিনে, তাঁর উম্মাহর জন্য। আল্লাহ্‌স্মা
সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

এই মানুষটার কথা স্মরণ করুন। তাঁর জীবন, তাঁর শিক্ষা, তাঁর সুন্যাহ, তাঁর আখলাকের
ব্যাপারে জানুন। যেই মহান সত্ত্বা তাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর ব্যাপারে সচেতন হোন।

নিজের পরিবার, আর প্রাণের জন্য ভালোবাসাকে এক পাল্লায় তুলে এই মানুষটার জন্য
আপনার মনে যতোটুকু ভালোবাসা আছে সেটাকে অন্য পাল্লায় রাখুন। দুনিয়ার মায়া,
সম্পদ, গা-বাঁচানো জীবনকে এক পাল্লায় তুলে আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মানের
প্রশ্নকে আরেক পাল্লায় তুলুন।

পুরো পৃথিবীকে এক পাল্লায় তোলো আর মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-কে আরেক
পাল্লায় তুলুন।

আর বিচার করুন, আপনি আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কতটুকু ভালোবাসেন।

নিজেকে প্রশ্ন করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দায়িত্ব আপনি কতটুকু পালন করেছেন।

চিন্তা করুন, যদি হাশরের দিন তাঁর ﷺ সাথে তোমার দেখা হয়, আর এই প্রশ্নগুলো তিনি
ﷺ আপনাকে করেন, তাহলে কী জবাব দেবেন?

"অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে

দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী,
মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ালু করুণাশীল ও অতি দয়ালু"
(সূরা আত-তাওবাহ, ১২৮)

বিজ্ঞাপন

শব্দতরু
শব্দে কৃপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে

ফেমিনিজম

নিয়ে লেখা অন্যতম একটি বই

বই : নারী স্বাধীনতার স্বরূপ
লেখক : ড. ইয়াদ কুনাইবী
অনুবাদক : নাজমুল হক সাকিব
প্রকাশনী : শব্দতরু
মুদ্রিত মূল্য: ৩৪৭ টাকা মাত্র

নারী
স্বাধীনতার
স্বরূপ

ড. ইয়াদ কুনাইবী

নারাজমুল হক সাকিব
অনুবাদিত

বিজ্ঞাপন





গোয়া ইনকুইজিশন

পৰ্তুগিজ শাসনের কালো অধ্যায়

ইমরান রাইহান

২০ মে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কালিকট বন্দরে এসে ভিড়ে পৰ্তুগিজ জলদস্যু ভাস্কো দা গামার জাহাজ। এটি ছিল ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আগত প্রথম জাহাজ। স্থানীয় রাজার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ভাস্কো দা গামা কিছুদিন লুটপাট ও লুণ্ঠন শেষে পৰ্তুগাল ফিরে যায়। ১৫১০ সালে আলফোনসো দ্য আলবুকার্ক নামে আরেক জলদস্যুর নেতৃত্বে পৰ্তুগিজদের নতুন একটি বাহিনী এসে উপস্থিত হয় দক্ষিণ ভারতের উপকূলে। আলবুকার্কের নেতৃত্বে পৰ্তুগিজ জলদস্যুদের প্রায় ২০টি জাহাজ ছিল। এসব জাহাজে বড় বড় কামান স্থাপিত ছিল যা দিয়ে সহজেই মাইলখানেক দূরে গোলা নিক্ষেপ করা যেত।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আল বুকার্কের বাহিনী মান্দবি নদী অতিক্রম করে পানজিম নামে ছোট একটি দুর্গে আক্রমণ করে। দুর্গের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রহরীরা প্রাথমিক প্রতিরোধের পর গোয়ার দিকে পালিয়ে গেলে পৰ্তুগিজরা কেব্লাটি দখল করে। দুই মাস পর বিজাপুরের সুলতান ইউসুফ আদিল শাহ ৬০ হাজার সৈন্যের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। এক সপ্তাহের যুদ্ধে আলবুকার্কের বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটে। কিন্তু পিছু হটার সময় সে আশপাশের এলাকায় আক্রমণ করে এবং অল্পকিছু শিশু ও ধনী ব্যক্তি বাদে সকল মুসলমানকে হত্যা করে। এক্ষেত্রে তারা নারী, শিশু, বৃদ্ধ কোনো তোয়াক্বা করেনি। এটি ছিল ভারতবর্ষের বুকে ইউরোপিয়ানদের প্রথম গণহত্যা।

হত্যাযজ্ঞ সেরে গোয়া থেকে প্রায় আঠারো মাইল দক্ষিণে সরে যায় পৰ্তুগিজরা। সে সময় তারা খাদ্যসংকটের মুখে পড়ে। আল বুকার্ক চাচ্ছিলেন কিছুদিন অপেক্ষা করে পৰ্তুগিজ থেকে আসা জলদস্যুদের সাহায্যে ইউসুফ আদিল শাহর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু আগস্টের শেষদিকে ইউসুফ আদিল শাহ মারা গেলে পরিস্থিতি আবার নাটকীয় মোড় নেয়। সিংহাসনে বসেন সুলতানের নাবালগ ছেলে ইসমাইল আদিল শাহ, রাজ্যশাসনের কোনো দক্ষতাই যার ছিল না।

নভেম্বরের ২৫ তারিখ চূড়ান্ত আক্রমণ চালায় পর্তুগিজ জলদস্যুরা। অনভিজ্ঞ ইসমাইল আদিল শাহ পরিস্থিতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন এবং তার সেনারা যুদ্ধে পরাজিত হয়। পর্তুগিজরা দ্বিতীয়বারের মত পানজিম দখল করে, এরপর তারা মান্দবি নদী ধরে এগিয়ে যায় গোয়ার দিকে। গোয়া দখল করতে তেমন বেগ পোহাতে হয়নি আলবুকার্ককে, এক সপ্তাহের যুদ্ধের পর পিছু হটে সুলতানের বাহিনী। বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে শহরে প্রবেশ করেন আল বুকার্ক। বিজয় উদযাপনের জন্য নৃশংস এক পদ্ধতি বেছে নেন তিনি। শুরুতেই নির্দেশ জারি করেন শহরের সকল মুসলমানকে হত্যা করতে হবে।

নির্দেশ জারি হতেই গোয়ার পথঘাটে বসানো হলো একের পর এক ফাঁসির মঞ্চ। ঘরবাড়ি থেকে ধরে আনা হলো মুসলমানদের। একের পর এক ঝুলিয়ে দেয়া হলো ফাঁসিতে। লোকগুলো জানতেও পারলও না কী অপরাধে তাদের মৃত্যু দেয়া হচ্ছে। টানা তিনদিনে প্রায় ৬০০০ মুসলমানকে ফাসি দিল আল বুকার্কের সেনারা। বেশকিছু মহিলা ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিলেন পুরনো একটি মসজিদে। মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিল পর্তুগিজরা। নির্মমভাবে পুড়ে মারা গেলেন সবাই।

১৫১২ সালে আবারও আদিল শাহের বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পর্তুগিজরা। প্রায় এক মাস যুদ্ধের পর সুলতানের সেনাবাহিনী পিছু হটে। সৈন্যসংখ্যায় সুলতানের বাহিনী এগিয়ে থাকলেও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের দিকে পর্তুগিজরা এগিয়ে ছিল। বিশেষ করে তাদের দূরপাল্লার কামানগুলো সুলতানের সেনাবাহিনীর প্রচুর ক্ষতি করে। আদিল শাহের বাহিনী পিছু হটলে গোয়া ও আশপাশের এলাকায় পর্তুগিজদের শতভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোয়ায় পর্তুগিজদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি মজবুত হতেই এখানে এসে উপস্থিত হয় ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি। চার্চ সে সময় জলদস্যুদের মাধ্যমেই নিজের প্রভাব ও শক্তির বিস্তার করতে। ক্যাথলিক চার্চ চাচ্ছিল দ্রুত এই অঞ্চলে খ্রিস্টান উপনিবেশ গড়ে তুলতে এবং জনগণকে ধর্মান্তরিত করতে। শুরুর দিকে পর্তুগিজ জলদস্যুরাই অস্থায়ী চার্চ নির্মাণ করে নিজেরা সেগুলোর দেখভাল করতো। ১৫৩৮ সালে প্রথম একজন বিশপ এসে উপস্থিত হন গোয়ায়। তার আগমনের পর থেকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে জোর দেয় পর্তুগিজরা। শুরুর দিকে তারা আঞ্চলিক হিন্দু রাজাদের অনেকেই পর্তুগিজদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে তাদের নানা সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু বিশপের আগমনের পর বেশকিছু পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট হতে থাকে পর্তুগিজরা হিন্দুদেরকেও আর ছাড় দিবে না।

১৫৪০ সালে পর্তুগিজরা মন্দির ও মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেয়। সে বছর প্রচুর মন্দির ও মসজিদ ভাঙ্গা হয়। এক্ষেত্রে কোনো প্রতিবাদে কান দেয়া হয়নি। ১৫৪২ সালে ভারতবর্ষে আসেন প্রথম জেসুইট ফ্রান্সিস জেভিয়ার। তিনি ছিলেন খুবই ধর্মান্ব একজন

ব্যক্তি। তিনি এসেই স্থানীয়দের চাপ দেন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে। যারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন নির্মম শাস্তির। মাত্র এক মাসে তিনি জোরপূর্বক দশ হাজার হিন্দুকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। একবার একদিনেই একশো হিন্দু মুসলমানকে খ্রিস্টান হতে বাধ্য করেন তিনি। লোকজনকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করেই ক্ষান্ত হয়নি পর্তুগিজরা। তারা ধর্মান্তরিতদের উপর নজরদারি শুরু করে। তাদের জীবনে পুরনো ধর্মের কোনো ছাপ রয়ে গেছে কিনা সেদিকে রাখা হয় কড়া নজর। ১৫৪৫ সালের ১৬ মে রাজাকে লেখা এক চিঠিতে ফ্রান্সিস জেভিয়ার বলেন, খ্রিস্টানদের জন্য জরুরি জিনিসটি হচ্ছে পবিত্র ইনকুইজিশন। এখনো অনেকে ইহুদি ও মুসলমানদের মতই জীবনযাপন করছে। তাদের মনে ঈশ্বরের ভয় নেই, নুন্যতম চক্ষুলাজ্ঞাও নেই। রাজা যেন ভারতের এই বিশ্বস্ত প্রজাদের জন্য এই জরুরি জিনিসের ব্যবস্থা করেন।

ফ্রান্সিস জেভিয়ারের এই পত্র ছিল ইনকুইজিশনের সূচনাবিন্দু। ১৫৬০ সাল থেকে শুরু হয় স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের আদলে গোয়া ইনকুইজিশন। ইনকুইজিশন ছিল মূলত একটি ধর্মীয় আদালত। যেখানে ধর্ম অবমাননা বা এ ধরনের অভিযোগ তুলে যে কাউকে যে কোনো শাস্তি দেয়া যেত। এক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ যাচাই বা সাক্ষ্য প্রমাণের কোনো দরকার হত না। সাধারণত ইনকুইজিশনের আদালতে কারো নামে মামলা হলে শাস্তি এড়ানোর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেকের জন্যই বরাদ্দ হত নির্মম শাস্তি।

আদিল শাহের পুরনো একটি প্রাসাদে বসে ইনকুইজিশনের আদালত। ১৫৬০ সাল থেকেই আদালতে উপস্থাপন করা হয় একের পর এক মামলা। সে বছর ৫ ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পরেও গোপনে নিজেদের পুরনো ধর্ম পালন করছিল। ভয়ভীতি ও শাস্তির মাধ্যমে চলতে থাকে ধর্মান্তকরণ। শুধু হিন্দু মুসলমান নয় ইহুদিদেরকেও বাধ্য করা হয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে। ইনকুইজিশনের মূল্য লক্ষ্য ছিল নব্য খ্রিস্টানদের মন থেকে পুরনো ধর্মের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি একেবারে মুছে ফেলা।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী মুসলমানদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হত গোপনে সে নামাজ আদায় করে কিনা, রমজান মাসে পানাহার থেকে বিরত থাকে কিনা, ঘরে কোরআনুল কারিম কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থ আছে কিনা। হিন্দুদের ক্ষেত্রে খেয়াল করা হত তারা ভাতে লবন দেয় কিনা, বাড়ির সামনে তুলসী গাছ আছে কিনা, ঘরে কোনো দেবদেবীর মূর্তি আছে কিনা, পূজার দিনগুলিতে তারা উৎসব পালন করে কিনা। বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইনকুইজিশনের লোকজন যখন তখন যে কারো গৃহে তল্লাশি চালাত।

একজন মসজিদের ইমামকে ধরে আনা হয় তার এক আত্মীয়ের ঘর থেকে। খ্রিস্টান হওয়ার প্রস্তাব দিলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। শহরের চত্বরে এনে গাছের

সাথে বাধা হয় তাকে। ধারালো ছুরি দিয়ে তুলে নেয়া হয় বুকের চামড়া। তড়পাতে তড়পাতে মারা যান তিনি। তার লাশ ছুড়ে ফেলা হয় নদিতে। একজন বৃদ্ধ মহিলাকে তার স্বামীসহ জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। অভিযোগ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পরেও বাড়িতে এক কপি কোরআনুল কারিম রেখেছিলেন তারা।

নির্যাতনের জন্য গোয়া ইনকুইজিশনের আদালত বেছে নিয়েছিল ভয়াবহ কিছু পদ্ধতি। এর অনেকগুলোই স্প্যানিশ ইনকুইজিশন থেকে অনুকরণ করেছিল তারা। সবচেয়ে নির্মম শাস্তি ছিল জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। এক্ষেত্রে নারী, শিশু, বৃদ্ধ কাউকেই ছাড় দিত না পর্তুগিজরা। উঁচু করে স্থাপিত কাঠে ঝুলিয়ে আরেকটি শাস্তির পদ্ধতি বের করেছিল তারা। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির দু হাত বেধে একটি উঁচু কাঠে বেধে দেয়া হত। তারপর তাঁর দুই পয়ায়ে ঝুলিয়ে দেয়াক হত ভারি পাথর। পাথরের চাপে লোকটির পুরো শরীর ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হত। এভাবে নির্যাতন চালালে অনেক সময় লোকটির শরীর ছিঁড়ে গিয়ে সে মারাও যেত। অনেকসময় বন্দিকে উল্টো করে ঝুলিয়ে তার মুখের ভেতর ঠেসে দেয়া হত কাঠের টুকরো, গলায় বেধে দেয়া হত লোহার ব্যান্ড। তীব্র শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে সে। একজন পাদ্রি এসে নিত তার স্বীকারোক্তি। স্বীকারোক্তিতে কোনো ভুল প্রকাশ পেলে ঘোষণা করা হত মৃত্যুদণ্ড। অনেক সময় লোহার গদা দিয়ে পিটিয়ে বন্দিদের হাত পা খেঁতলে দেয়া হত। কখনো উত্তপ্ত লোহা গলিয়ে ফোটা ফোঁটা ফেলা হত বন্দির হাতে। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকতো সে, বাতাসে ভেসে বেড়াত চামড়া পোড়া গন্ধ। অনেককে শহরের উন্মুক্ত চত্বরে এনে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হত। অনেক সময় বন্দির শরীরের হাত পা বেধে দুই অংশ দুই ঘোড়ার পয়ায়ের সাথে বেধে দেয়া হত। এরপর ঘোড়া দুটিকে বিপরীত দিকে ছুটানো হত। মাঝ থেকে ফেটে যেত বন্দির দেহ। ফিনকি দিয়ে ছুটতো রক্ত, তা দেখে উল্লাসে মেতে উঠত পর্তুগিজরা।

অনেককে ইনকুইজিশনের কারাগারে বন্দি রাখা হত মাসের পর মাস। চার্লস ডেলন নামে একজন ফরাসি চিকিৎসককে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বন্দি করা হয় ১৬৭৪ সালে। প্রায় তিন বছর ইনকুইজিশনের আদালতে বন্দি থাকেন তিনি। নির্যাতনের কারণে কয়েকবার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টাও চালান। ১৬৭৭ সালে মুক্তির পর তিনি ইনকুইজিশনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি স্মৃতিকথা লেখেন। সেখানে তিনি বলেন, নভেম্বর ও ডিসেম্বরের ভোরগুলোতে বন্দিদের তীব্র আর্তচিতকার শোনা যেত। আমার পাশের কক্ষেই তাদের নির্যাতন করা হত। নারী পুরুষ সব ধরনের মানুষকেই দেখেছি কারাগারে। শাস্তির ক্ষেত্রে কাউকেই ছাড় দেয়া হয়নি। অনেককে এমনকি উলঙ্গ করেও শাস্তি দেয়া হত। ডেলনের বর্ণনা থেকে জানা যায় আদিল শাহের প্রাসাদের প্রায় দুইশোটি কক্ষে লোকজনকে বন্দি রাখা হত। এসব কক্ষের বেশিরভাগে আলো বাতাস প্রবেশের কোনো সুযোগ ছিল না।

গার্সিয়া ডিওর্তা ছিলেন একজন পুর্তগিজ উদ্ভিদবিদ। তিনি ছিলেন ইহুদি ধর্মের অনুসারী। পর্তুগালে অবস্থানকালে তার পরিবারকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হয়। তিনি গোয়ায় এসে উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করেন। ১৫৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তার লেখা বই ইন্ডিয়ান মেডিসিনাল প্লান্টস। ১৫৬৮ সালে তিনি মারা যান। পরের বছর ইনকুইজিশনের নজর পরে তার পরিবারের উপর। অভিযোগ তোলা হয় তিনি মনেপ্রাণে খ্রিস্টান হতে পারেননি, গোপনে ইহুদি ধর্ম পালন করতেন। তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আত্মীয় স্বজনদের বন্দি করে তীব্র নির্যাতনের মুখোমুখি করা হয়। ১৫৬৯ সালে তার বোনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এতেই ক্ষান্ত হয়নি ইনকুইজিশনের আদালত। ১৫৮০ সালে সমাধি থেকে তোলা হয় গার্সিয়ার মৃতদেহ। আগুনে পুড়িয়ে ছাইগুলো ফেলে দেয়া হয় ময়লার ভাগাড়ে।

পর্তুগিজরা গোয়ায় কোংকনি, আরবি, মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষার বইপত্র নিষিদ্ধ করে। মুসলমানদের ধর্মীয় সকল প্রতীক নিষিদ্ধ করা হয়। মসজিদগুলো আগেই ধ্বংস করা হয়েছিল, কেউ ঘরে একাকী লুকিয়ে নামাজ পড়বে সে উপায়ও ছিল না। রোজার দিনে লক্ষ্য রাখা হত কেউ পানাহার থেকে বিরত থাকছে কিনা। আতংকের সেই দিনগুলিতে অলিগলিতে টহল দিচ্ছিল পাদ্রি ও গির্জার লোকেরা। সামান্য সন্দেহ হলেই তুলে নিয়ে যাচ্ছিল ইনকুইজিশনের আদালতে, যেখান থেকে ফেরার কোনো উপায় ছিল না। গোয়ার মুসলমানদের জন্য ইনকুইজিশনের এই সময়টি ছিল দুঃসহ অভিজ্ঞতা। তাদের অনেকে আশপাশের এলাকায় হিজরত করেছিলেন। যারা তা করতে পারেননি, তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল নির্মম শাস্তি। একে একে সবাইকেই শাস্তির মুখোমুখি করা হয়েছিল।

১৬৬৯ সালে রাজার পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসে অনাথ হিন্দু মুসলমান বালকদের গির্জার অধীনে দিতে হবে। তাদের উপর তাদের পরিবারের কোনো কতৃত্ব চলবে না। শুরু হয় অনাথ বালকদের ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া। সে সময় হিন্দু মুসলমান সবার মধ্যেই দাসপ্রথা চালু ছিল। পর্তুগিজরা ঘোষণা করে কোনো দাস যদি খ্রিস্টাধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। তার উপর মালিকের কোনো কতৃত্ব থাকবে না। শুরু হয় দাসদের মধ্যে ধর্ম পরিবর্তনের হিড়িক।

হিন্দুদের ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান বন্ধের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল পর্তুগিজরা। ১৫৬৪ সালে গোয়ার একটি নদীতে হিন্দুরা একত্র হয় স্নান করার জন্য। জেসুইট জানতে পেরে নির্দেশ দেন একটু গরু জবাই করে তার রক্ত নদীতে ফেলা হোক। আদেশ বাস্তবায়িত হলে হিন্দুরা সরে যায়। গরুর রক্তমেশা পানিতে স্নান করতে রাজি হয়নি তারা।

কোর্ট অব ইনকুইজিশন চালু ছিল প্রায় তিনশো বছর। ১৮১২ সালে গোয়া ইংরেজদের

নিয়ন্ত্রণে এলে বন্ধ হয় কোর্ট অব ইনকুইজিশন। স্বধর্মের লোকদের অপরাধ গোপন করতে ইংরেজরা পুড়িয়ে ফেলে কোর্টের সকল নথিপত্র। ফলে ঠিক কত লোককে ইনকুইজিশনের মুখোমুখি করা হয়েছিল তা আর জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা যায়, ১৫৬১-১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার মানুষকে ইনকুইজিশনের আদালতের মুখোমুখি হতে হয়। বলাবাহুল্য, তাদের প্রত্যেককেই দোষী সাব্যস্ত করে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়।

উগ্র হিন্দুত্ববাদিরা আজকাল সুলতান আলমগিরের নামে মন্দির ধ্বংসের বানোয়াট অভিযোগ করলেও রহস্যজনকভাবে পর্তুগিজদের সম্পর্কে তারা নিশ্চুপ। অথচ পর্তুগিজদের হাতে গোয়াতে অন্তত ৫০০ মন্দির ধ্বংস হয়েছে। গবেষক শেফালি ভদ্র জানাচ্ছেন, বর্তমানে গোয়ায় পর্তুগিজ শাসনের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত শুধু একটি মন্দির টিকে আছে। অন্য যেগুলো আছে সবই পর্তুগিজ শাসনের পরে প্রতিষ্ঠিত। গোয়াতে বর্তমানে প্রচুর খ্রিস্টানের বসবাস। এদের বেশিরভাগের পূর্বপুরুষ ছিল হিন্দু। জোরপূর্বক তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল।

গোয়া ইনকুইজিশনের অন্যতম কালপ্রিট ছিলেন ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স। কিন্তু তার অপকর্মের কালো ইতিহাস মুছে দিতে মিশনারিরা গ্রহণ করেছে নানা পদক্ষেপ। তাকে মহান ধর্মপ্রচারক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের নানা দেশে তার নামে প্রতিষ্ঠা করেছে স্কুল কলেজ। ২৯টি দেশে ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের নামে স্থাপিত হয়েছে ২৭৭ টি স্কুল ও কলেজ। শুধু ভারতেই স্থাপিত হয়েছে একশোর বেশি। বাংলাদেশেও আছে এই খলনায়কের নামে স্কুল। পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে ১৯১২ সালে মিশনারিরা প্রতিষ্ঠা করে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল। এসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের সামনে ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সকে উপস্থাপন করা হয় মহান সাধু হিসেবে, আড়ালে রাখা হয় তার মানবাতাবিরোধি অপরাধের বিশাল আখ্যান।

ব্যাসিলিকা অব বোম জেসাস নামে প্রায় চারশো বছরের পুরনো একটি গির্জা আছে গোয়াতে। এই গির্জায় একটি কাচের বক্সে সংরক্ষণ করা হয়েছে ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের মৃতদেহ। এখনো বিশেষ বিশেষ দিনে খ্রিস্টানদের দেখানোর উদ্দেশ্যে বের করা হয় এই মৃতদেহ। শ্রদ্ধার সাথে সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় খ্রিস্টানরা। সাম্রাজ্যবাদী লুটেরারা নিজেদের অপরাধীদের নিয়ে গর্ব করলেও আমরা নিজেদের সত্যিকারের হিরোদের নাম মুখে নিতে লজ্জিত হই, আমাদের এ লজ্জাও সাম্রাজ্যবাদের শেখানো।



ইলম অর্জনের মুতাওয়ারাস ধারা

মাহমুদ সিদ্দিকী

“একজন মানুষের ইলম অর্জনের পথ দুটি। এক, মানবকর্তৃক শিক্ষার পথ। দুই, রব কর্তৃক শিক্ষার পথ। প্রথম পথটি সুবিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত। মানবকর্তৃক শিক্ষাদানের পদ্ধতি আবার দুটি। এক, বাহ্যিক—ব্যক্তির কাছ থেকে শেখার মাধ্যমে ইলম অর্জন করা। অপরটি হলো—চিন্তা ফিকিরের মাধ্যমে ইলম অর্জন করা”। বলেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি রহ.। (১) রব কর্তৃক শিক্ষার পথটি নবিদের সাথে বিশিষ্ট। সাধারণ মানুষের শিক্ষার মাধ্যম হলো মানবকর্তৃক শিক্ষার পথ। এখন বিবেচ্য বিষয় হলো—ইলম অর্জনের কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত মুতাওয়ারাস পদ্ধতি কোনটি? আমাদের অনুসরণীয় উত্তরসূরী সাহাবায়ে কেলাম ও সালাফে সালিহীন কোন পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করেছেন?

ইলম অর্জনের কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মুতাওয়ারাস ধারা মৌলিকভাবে সর্ব যুগে একটিই।

নববি যুগ থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত; আগামী থেকে ভবিষ্যত পর্যন্ত—সর্বযুগে এটিই থাকবে মৌলিক ও সহিহ ধারা হিসেবে। এই মুতাওয়ারাস ধারাটি হলো—কোনো একজন উস্তাদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করা। কুরআনে ইলম অর্জনের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে যে-আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে আয়াতের ভাষ্য হলো—“যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো”। (২) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসকল দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো—শিক্ষাদান। যার ঘোষণা কুরআন দিয়েছে এভাবে—(ইবরাহিম আলাইহিসসালাম দুআ করছেন—) “প্রভু, আপনি তাদের মাঝে প্রেরণ করুন তাঁদের মধ্য থেকে একজন রাসূল; যিনি তাদেরকে তিলাওয়াত করে শোনাবেন আপনার আয়াতসমূহ এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমত; এবং পরিশুদ্ধ করবেন তাদেরকে...”। (৩)

আয়াতে বর্ণিত রাসূল হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; কিতাব হলো কুরআন এবং হিকমত হলো সুন্নাতে নবি। (৪)

তো, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দুআ বিবৃত করার মাধ্যমে নবিজির মোট চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এক. নাখিলকৃত কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো। দুই. কিতাব শিক্ষা দেওয়া। তিন. হিকমত শিক্ষা দেওয়া। চার. এবং উম্মতকে তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধ করা। কিতাব এবং হিকমত—এ দুটিই হলো ইলম। আর এ দুটি শেখার মাধ্যম কুরআনে বিবৃত হচ্ছে তা'লিম শব্দে; যার অর্থ—অপরকে শেখানো। একইভাবে হাদিসে নবিতেও স্বয়ং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন এভাবে—“নিঃসন্দেহে আমি প্রেরিত হয়েছি মুআল্লিম (শিক্ষক) হিসেবে”। (৫) যেহেতু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাই সাহাবায়ে কেলামকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয় শিক্ষা দিতেন। এমনকি ইস্তেঞ্জা কীভাবে করতে হবে—তাও শিখিয়ে দিতেন। শিক্ষা দিতে গিয়ে বলছেন—“আমি তোমাদের পিতার মতো, তোমাদেরকে শেখাই...”। (৬)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসগুলোতে ইলম অর্জন ও ইলম শেখানোর ব্যাপারে নির্দেশনা ও ধারাবর্ণনা দিয়ে যে-দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো—তা'লিম ও তাআল্লুম। প্রথমে শব্দদুটির অর্থ জেনে নেওয়া যাক। এক কথায় তা'লিম হলো কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষাদান; আর তাআল্লুম হলো কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ। আধুনিক আরবিভাষা অভিধানের রচয়িতা ড. আহমদ মুখতার আব্দুল হামিদ (১৪২৪ হি.) লেখেন—“তা'লিম হলো—ছাত্রদেরকে বিভিন্ন উলুম ও ফুনুন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্র পাঠদান করা”। (৭)

আল্লামা মুরতাযা যাবিদি (১২০৫ হি.) রচিত সুবিশাল অভিধানগ্রন্থ তাজুল আরুসে লেখেন—“কতক ভাষাবিদ বলেন, তা'লিম হলো—পাঠের অর্থগ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তিকে নির্দেশনা দেওয়া। আর তাআল্লুম হলো ব্যক্তিকর্তৃক সেই নির্দেশনা গ্রহণ করা। (৮) অর্থাৎ, তা'লিম ও তাআল্লুম শব্দদুটো স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিকে ইলম শেখানো বা ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম অর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? আরেকটু খোলাসা করা যাক। ইলম অর্জনের পদ্ধতি কী হবে—এই নির্দেশনা দিতে গিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাষায় বলছেন এভাবে—“ইন্না মাল ইলমু বিত-তাআল্লুম; অর্থাৎ ইলম অর্জনের একমাত্র পদ্ধতি হলো তাআল্লুম”। (৯) হাদিসে বর্ণিত এই বাক্যটির প্রথম শব্দ হচ্ছে—‘ইন্না মা’। আল্লামা ইবনে মানযুর (৭১১ হি.) বলছেন—“ইন্না মার অর্থ হলো এর পরের অংশকে সুসাব্যস্ত করা এবং এছাড়া অন্য সবকিছুকে নাকচ করা”। (১০) মূল শব্দটি ‘ইন্না’, নিশ্চয়তা জ্ঞাপক শব্দ। এর পরে ‘মা’ যুক্ত হয়ে যখন ‘ইন্না মা’ হয়—তখন আরবি ব্যাকরণের নীতি

অনুযায়ী শব্দটি তার পরের বাক্যের দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশের সাথে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। নাহর ভাষায় যাকে বলে—‘হাসর’। (১১) বাংলায় এক শব্দে এর অর্থ হয়—‘শুধু, কেবল’, এই জাতীয় শব্দ। এখানে বাক্যের প্রথম অংশ ইলম, দ্বিতীয় অংশ তাআল্লুম। অর্থাৎ, তাআল্লুমকে ইলমের সাথে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। তাহলে হাদিসটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে—“তাআল্লুমের দ্বারা যে-ইলম অর্জিত হয়, কেবল সেটাই ইলম”। এটা গেল বৈয়াকরণিক আলোচনা। এবার হাদিসটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও মান দেখা যাক।

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি (৮৫২ হি.) রহ. হাদিসটি উল্লেখ করার পর এর ব্যাখ্যায় লেখেন—“হাদিসটির অর্থ হলো—একমাত্র গ্রহণযোগ্য ইলম সেটাই, যা নবিগণ ও তাঁদের উত্তরসূরিদের থেকে তাআল্লুমের পদ্ধতিতে অর্জন করা হয়েছে”। (১২)

হাদিসটি বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে তা’লিক হিসেবে; অর্থাৎ সনদ ছাড়া। ইমাম বুখারি রহ. সহিহ হাদিসগ্রন্থে যেসব হাদিস তা’লিক হিসেবে এনেছেন, সাধারণভাবে সেসবের সর্বনিম্ন মান হলো—হাদিসটি হাসান। অবশ্য খুব সীমিত সংখ্যক হাদিসের ব্যাপারে শাস্ত্রবিদগণ যইফও বলেছেন। উপর্যুক্ত হাদিসটি বুখারিতে তা’লিক হিসেবে এলেও মারফু’ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে বাযযারে (২৯২ হি.), ইমাম তাবারানির (৩৬০ হি.) আল-মু’জামুল কাবিরে। (১৩) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. হাদিসটির মান সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—হাদিসটির সনদ হাসান। (১৪)

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত ইলম অর্জনের যে-পথটির কথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তা হলো—তাআল্লুম তথা কোনো একজন উস্তাদের সান্নিধ্য থেকে ইলম অর্জন করা।

২.

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে—সাহাবায়ে কেরাম উম্মাহর আদর্শ ও সত্যের মাপকাঠি। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরা শতভাগ আমানতদারির সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। আমাদের যারা আদর্শ ও অনুসরণীয়, সেই সাহাবায়ে কেরাম ঠিক কীভাবে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছেন?

এই প্রশ্নের জবাব বিশিষ্ট সিরাত ও ইতিহাস গবেষক, মুফাক্কিরে ইসলাম আলি নদভি দিয়েছেন চমৎকারভাবে। আলি মিয়াঁ লিখেছেন—“(নববি যুগে) তা’লিম ছিল বাস্তবমুখী তা’লিম। জিহাদের ময়দানে, জীবনের কর্মব্যস্ততায়, ঘরোয়া ঝামেলায় এবং সফরের বিরতিতে—তা’লিম চলত সর্বক্ষেত্রে। শিক্ষা-উপকরণ তখন নিষ্প্রাণ বইপুস্তক ছিল না;

বরং শিক্ষার উপকরণ ছিল প্রাণবন্ত ও স্পন্দিত ব্যক্তিপ্রাণ। যার সান্নিধ্য প্রভাব ফেলত সর্বক্ষেত্রে; সকল প্রয়োজনে থাকত তাঁর দিকনির্দেশনা। ফলে মানুষ সান্নিধ্যের সৌরভে ধর্মের বোধ ও এর মাধ্যম ছাড়াই আমল ও প্রায়োগিক ইলম শিখে ফেলত। ভাষা যেমন শিখতে হয় ভাষাভাষীদের মধ্যে থেকে; সভ্যতা শিখতে হয় সভ্য ও মার্জিত মানুষদের সান্নিধ্যে থেকে—তেমনি স্বভাবসুলভ পন্থায় মানুষ দীনদারদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে দীন শিখত”।

একই প্রবন্ধের পরের পৃষ্ঠায় আলি নদভি আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন—“সাহাবায়ে কেলাম দীন শিখেছেন সুহবত ও খিদমত—সান্নিধ্য ও সেবার মাধ্যমে। দীন ও ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নামের পাশে রয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে—তাঁরা দ্বীনের প্রকৃত রূপ-রস ও প্রাণ ধারণ করতে পেরেছিলেন। যেমনটা চমৎকারভাবে চিত্রায়ন করেছেন মহান সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.—‘এঁরা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরবর্গ; হৃদয় তাঁদের সবার চেয়ে সৎ, ইলম তাঁদের সকলের চেয়ে গভীর, আর কৃত্রিমতা তাঁদের মাঝে সবার চেয়ে কম’।” (১৫)

ইতিহাসও আলি নদভির এই বক্তব্যের শতভাগ সমর্থন করে। হাদিস, সিরাত, তারিখ ও মা'রিফাতুস সাহাবা সংক্রান্ত সকল কিতাব উচ্চকিত কণ্ঠে এই সত্য জানান দেয়। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে একটিমাত্র হাদিসের জন্য জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর সফর।

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস আল-জুহানি রা.। বাইআতুল আকাবায় যে সত্তুর জন আনসার সাহাবি অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন। অংশগ্রহণ করেছেন উহুদ ও পরবর্তী অনেক জিহাদে। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস মদিনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গেছেন। মধ্যে মিসরে ছিলেন কিছুদিন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. জানতে পেরেছেন, ইবনে উনাইস সিরিয়ায় আছেন। তাঁর কাছে একটি হাদিস আছে, যা তিনি এখনো শুনেনি। জাবের রা. সিদ্ধান্ত নিলেন—একটিমাত্র হাদিসের জন্য সফর করবেন। ক্রয় করলেন সওয়ারি। এক মাস রিহলাহ করে পৌঁছলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসের কাছে। (১৬)

৩.
কেবল সাহাবায়ে কেলাম নন, সালাফে সালিহিনের মাঝেও ইলম অর্জনের যে-ধারাটি চলমান ছিল তা হলো—উস্তাদের সাহচর্যে ইলম অর্জন করা। উস্তাদের সাহচর্য লাভের জন্য সে-যুগে রিহলাহ ছিল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কে কতটি দেশে রিহলাহ করেছে, কতজন শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছে—ব্যক্তির ইলমি অবস্থান নির্ণয়ের

এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। যার রিহলাহ যত কম, যে যত কম শায়খের সাহচর্য লাভ করেছে, ইলমি বিবেচনায় তার অবস্থান হতো অন্যদের চেয়ে তত নিচে। তারিখ ও রিজালের কিতাবাদি সালাফে সালিহিনের রিহলাহর বর্ণনায় ভরপুর। এমন একজন ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার জীবনে একাধিক রিহলাহর ঘটনা নেই। খোদ এই রিহলাহ নিয়ে খতিব বাগদাদি রহ. (৪৬৩ হি.) স্বতন্ত্র কিতাবই রচনা করে ফেলেছেন। নাম দিয়েছেন—আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস। একটিমাত্র হাদিসের জন্য বিরাট-বিরাট রিহলাহ ছিল তাঁদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। তেমনই এক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন আবু দারদা রা.-এর শাগরিদ কাসির ইবনে কায়স রহ.। তিনি বলছেন—

“একবার আবু দারদা রা.-এর সাথে দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বলল, ‘হে আবু দারদা, আমি মদিনাতুর রাসুল থেকে এসেছি; একটি হাদিসের অশ্বেষণে। জানতে পেরেছি আপনি সেই হাদিসটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন’।

- ‘অন্য কোনো প্রয়োজনে আসোনি’? আবু দারদা অবাক হয়ে জানতে চান।
- ‘না’। জবাব দেয় লোকটি।
- ‘ব্যবসার কাজেও আসোনি’? সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করেন।
- ‘না’। শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় আগন্তুক।
- ‘কেবল এই হাদিসটির জন্যই এসেছ’? আরও অবাক হন আবু দারদা।
- ‘জি’। দৃষ্ট কণ্ঠ হাদিস অশ্বেষীর।

আবু দারদা রা. বললেন—‘তাহলে শোনো; আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম অশ্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, সে এর মাধ্যমে মূলত জান্নাতের একটি পথ অবলম্বন করে। আর ফেরেশতারা তো তালিবেইলমের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেয়। পূর্ণিমা রাতে অন্যসব নক্ষত্রের ওপর চাঁদের যেমন অবস্থান, নিশ্চিতভাবে সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর একজন আলিমের মর্যাদা ও অবস্থান অনুরূপ। আর আলিমের জন্য ক্ষমার দুআ করতে থাকে আসমান-যমিনে থাকা সবাই এবং সবকিছু; এমনকি সমুদ্রের গহিনের মাছও। নিশ্চিত থেকে, আলিমগণ হলেন নবিগণের উত্তরসূরি। নবিগণ উত্তরাধিকার রূপে পয়সা-কড়ি রেখে যান না; তাঁরা রেখে যান ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করবে সে যেন পূর্ণরূপে অর্জন করে’। (১৭)

এ তো কেবল দুয়েকটি ঘটনা। এমনতর হাজারও ঘটনা সালাফের জীবনীতে বিদ্যমান। উপরোক্ত কথাগুলো সামনে রেখে যে-বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠছে তা হলো—শুধু খায়রুল কুরুন নয়; বরং আজ অবধি ইলম অর্জনের মুতাওয়ারাস ধারা

হতো, এই পদ্ধতি তা থেকে মুক্ত ছিল”। (২০)

মোটামুটি একশো হিজরি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক গ্রন্থ রচনার কোনো ব্যাপার ছিল না। ১৫০ হিজরির পূর্বে ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহ. (১৫০ হি.) (তর্কসাপেক্ষে) সর্বপ্রথম সুবিন্যস্ত আকারে গ্রন্থ রচনা করেন—কিতাবুল আসার। (২১) কাছাকাছি সময়ে মক্কায় ইবনে জুরাইজ (১৫০ হি.) ও শামে আওয়ালি (১৫৭ হি.), কুফায় সুফিয়ান সাওরি (১৬১ হি.), এবং বসরায় হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (১৬৭ হি.) সহ বেশ কয়েকজন ইমাম গ্রন্থ রচনা করেন। সুয়ুতি রহ. এককভাবে ইমাম আ'যমকে প্রথম সুবিন্যস্ত গ্রন্থরচনার কৃতিত্ব দিলেও অন্য অনেকে এলাকাভিত্তিক প্রথম রচয়িতা হিসেবে একাধিক গ্রন্থকারকে এই কৃতিত্ব দেন। (২২) দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রন্থ রচিত হলেও গ্রন্থ কেবল ছিল সামনে রাখার জন্য। গ্রন্থ কখনো ইলম অর্জনের মূল মাধ্যম ছিল না। মূল ইলম অর্জন হতো সরাসরি দরসে। কিতাব সামনে থাকত কেবল ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের জন্য। হয়ত ছাত্র পড়তেন আর উস্তাদ ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করে দিতেন; অথবা উস্তাদ পড়তেন আর ছাত্ররা কিতাবে মিলিয়ে নিয়ে দেখতেন—তার অনুলিপি ঠিক আছে কি না।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইলম অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাঠামো ছিল না। এর আগ পর্যন্ত ইলম অর্জনের মাধ্যম ছিল বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভিন্ন শায়খের সান্নিধ্যে অবস্থান করা। কেউ-কেউ মসজিদে সাপ্তাহিক দরস দিতেন বটে। তবে সেটা কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের তত্ত্বাবধানে ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় মন্ত্রী নিয়ামুল মুলক খাজা হাসান তুসি মুসলমানদের ইলম অর্জনের সুবিধার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোস্বরূপ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন এলাকায় জামিয়া নিয়ামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন বটে; কিন্তু শিক্ষার ধারা সেই মুতাওয়ারাস ধারাই ছিল। ছাত্ররা উস্তাদদের কাছ থেকে ইলম শিখতেন। এর আগে মিসরে ফাতেমি শাসনের ছত্রছায়ায় জামিয়া আযহার প্রতিষ্ঠিত হলেও সেটি মূলত শিয়াদের বিষবাস্প ছড়াছিল বলে একে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থায় গণ্য করা যায় না। (২৩)

মোটকথা, কিতাব রচনার যতই উন্নয়ন ও জোয়ার ঘটুক না কেন, কিতাবের ইলম সহিহভাবে অর্জনের জন্যই রিজালের প্রয়োজন হয়েছে। এখানে অষ্টম শতাব্দীর বিশিষ্ট আলিম আবু ইসহাক শাতিবির (৭৯০ হি.) কথাগুলো সামনে রাখা জরুরি। তিনি লিখেছেন—“ইলম প্রাথমিকভাবে দুই প্রকার। এক. অতীব জরুরি; যা জন্মগতভাবেই মানুষ জানে। উদাহরণস্বরূপ—জন্মগতভাবেই একটি বাচ্চা এই জ্ঞান নিয়ে জন্মায় যে, খিদে পেলে তাকে কাঁদতে হবে। দুই. তা'লিমের মাধ্যমে যে-ইলম অর্জন করতে হয়। যে ইলম অর্জনের জন্য ভাবনা ও চিন্তার দরকার হয়, সে ইলমের জন্য অবশ্যই একজন মুআল্লিম প্রয়োজন। কেউ-কেউ মতবিরোধ করে—মুআল্লিম ছাড়া আদতে ইলম অর্জন করা সম্ভব, নাকি অসম্ভব? সম্ভাব্যতা মেনে নেওয়া যায় বটে; কিন্তু সাধারণ বাস্তবতা

একটিই—সুহবত ও খিদমত; সান্নিধ্য ও সেবা। সুতরাং ইলম অর্জন করতে হলে আলিমের কাছে যেতে হবেই; এর বিকল্প নেই। বইপুস্তক কিংবা প্রাণহীন জড় কিতাবাদি কখনো এর বিকল্প হতে পারে না।

এই কথাটি আরও সুস্পষ্ট করে বলেছেন বিশিষ্ট গবেষক আলিমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিয়াহুল্লাহ। তিনি লিখেছেন—“দ্বীন শেখার এবং ইলমে দ্বীন হাসিল করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল, সুন্নাহের অনুসারী সহীহ আকীদাসম্পন্ন বুয়ুর্গ ও আলেমে দ্বীনের সোহবত ও নেগরানি (তত্ত্বাবধান ও সাহচর্য অবলম্বন)। দ্বীন শেখার এবং ইলমে দ্বীন হাসিল করার এটাই স্বভাবজাত পথ। ইসলামের শুরু যুগ থেকে এ পর্যন্ত দ্বীন শেখার এ রীতিই চলে আসছে। এর কোনো বিকল্প নেই। বিকল্প থাকা সম্ভবও নয়। তবে এ পন্থা অবলম্বনের পাশাপাশি সহায়ক একটি পন্থা আছে। তা হল, দ্বিনী গ্রন্থ পাঠ করা”। (১৮)

গাযালি রহ. তা’লিম ও তাআল্লুমের একটি চমৎকার প্রতীকী চিত্র বর্ণনা করেছেন। গাযালি বলছেন—

“জমিতে যেমন বীজ রোপিত থাকে, গহিন সমুদ্র কিংবা খনি-গহ্বরে থাকে মুক্তোদানা, তেমনি মৌলিকভাবে প্রতিটি মানুষের মাঝে ইলম অর্জনের প্রতিভা বিদ্যমান। তাআল্লুম হলো—সেই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে চাওয়া; আর তা’লিম হলো—সেই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটানো। এজন্য মুতাআল্লিম (ছাত্র) তার মুআল্লিমের সাদৃশ্য অবলম্বন করে নৈকট্য অর্জন করে। সাদৃশ্যের বিচারে সেই আলিম হলেন চাষী, তার শিক্ষার্থী হলো জমি, শিক্ষার্থীর অন্তরে সুপ্ত প্রতিভা হলো বীজ; আর যতটুকু ইলম সে বাস্তবে অর্জন করেছে তা হলো উদ্ভিদ। ছাত্রের প্রতিভার স্ফুরণ যখন পূর্ণতা লাভ করবে, তখন সে হয়ে যাবে ফলবান বৃক্ষ”। (১৯)

৪.

একথা সুবিদিত যে, ইলম অর্জনের এই ধারা আজ অবধি চলমান। এই ধারা শুধু উম্মতে মুহাম্মাদির তাওয়ারুস বা উত্তরাধিকার নয়; বরং নবিদের থেকে চলে আসা উত্তরাধিকার। মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা আলি নদভি একথাই বলছেন—“কিতাব ও পুস্তক ব্যতীত ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম শেখা হলো নবিদের অনুসৃত পদ্ধতি। বিশেষ করে সাইয়িদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য। এক কিতাব থেকে অন্য কিতাবে ইলম স্থানান্তর নবিজির শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না। বরং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন রবের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করে প্রথমে হৃদয়ফলকে লিপিবদ্ধ করতেন। তারপর অন্যদেরকে সেই ইলম শেখাতেন। এই পদ্ধতিতে লাখ-লাখ মানুষ খুব অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় ইলম শিখে নিতে পারত। প্রায় সময় আক্ষরিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আমল ও তাছিরের ক্ষেত্রে যেসব অসম্পূর্ণতার মুখোমুখি হতে

হলো—মুআল্লিম ছাড়া কোনো গতি নেই। সামগ্রিকভাবে এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।...শিক্ষক যে অপরিহার্য—এটা বোঝার জন্য যুগ-যুগ ধরে চলে আসা শিক্ষাপদ্ধতিই যথেষ্ট। তাছাড়া আলিমগণ তো বলেছেন—‘ইলম এককালে ছিল রিজালের অন্তরে; পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে গেছে কিতাবের পাতায়। তবে কিতাব খোলার চাবি রয়ে গেছে রিজালের হাতে’। (২৪)

ইমাম শাতিবি তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী আলিমদের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে যে-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হলো—“ওয়াকাদ কালু...”; এর বাংলা করা হয়েছে ‘আলিমগণ তো বলেছেন’। “ওয়াকাদ কালু” বলার স্বাভাবিক ধারা থেকে বোঝা যায়—তাঁর সমকালে আলিমদের এই কথা সকলের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল। যার ফলে আলাদা করে এই বক্তব্য কারও দিকে সম্পৃক্ত করে বলতে হয়নি। তার মানে বোঝা যাচ্ছে—অষ্টম শতাব্দীতেও এই কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, কিতাবে ইলম লিপিবদ্ধ হয়ে গেলেও এর চাবিকাঠি ব্যক্তির কাছেই রয়ে গেছে।

এখানে সহিহ বুখারির একটি হাদিস উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ইলম কীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে—এর বিবরণ দিতে গিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন : “নিশ্চয় আল্লাহ মানুষদের থেকে ইলম এক দফায় ছিনিয়ে নিয়ে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদেরকে তুলে নেবার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে একজন আলিমকেও যখন অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ মূর্খ লোকদেরকে অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করা হবে আর তারা না জেনে ফতোয়া দিবে। তখন এরা নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে; অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করবে”। (২৫)

অর্থাৎ, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার থাকলেও আলিমদেরকে যখন উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন ব্যক্তির সাথে ইলমও দাফন হয়ে যাবে। এভাবেই একদিন পৃথিবী ইলমশূন্য হয়ে পড়বে।

৫.
এখন স্বভাবতই প্রশ্ন দাঁড়ায়—তাহলে কিতাব-পুস্তক ও গ্রন্থের কাজ কী? কিতাবের কাজ হলো—ইলমকে লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করা এবং কিতাবে সংরক্ষিত ইলম যেন সহিহভাবে হৃদয়ে সংরক্ষণ, আত্মস্বকরণ ও আমল করা সম্ভব হয়—এজন্য রিজালের সুহবত ও তা’লিমের মাধ্যমে তা অধ্যয়ন করা। এককথায়, কিতাব বা গ্রন্থ হলো ইলম অর্জনের সহায়ক মাধ্যম। মৌলিক ও স্বতন্ত্র কোনো পন্থা নয়। যেমনটা পূর্বে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ। এই প্রশ্নের উত্তর আলি মিয়াঁ আরও সুন্দর করে দিয়েছেন। মুসলমানদের সার্বিক তা’লিম-তরবিয়ত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুতাওয়ারাস ধারাটি আলোচনা করার পর আলি মিয়াঁ লিখেছেন—“কিতাব তো মূলত ভুল-শুদ্ধ জানার মানদণ্ড।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যেমনটা বলেছেন—‘কেউ যদি কাউকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে যেন এমন কাউকে আদর্শ বানায়, যিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিতনার ব্যাপারে নিরাপদ নয়’। তো, কিতাব হলো সালাফে সালিহিনকে অনুসরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু কিতাব, ইলমি পুস্তিকা; ইলমি ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক ব্যতীত এসবের ফায়দা অর্জিত হয় না। সুতরাং ইলমি ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক হলো প্রকৃতপক্ষে কিতাব থেকে পূর্ণ ফায়দা অর্জন করার মাধ্যম”। (২৬)

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে—ইলমের সাথে সম্পর্ক নেই কিংবা দ্বীনদারির সাথে নতুন পরিচিত হয়েছেন এমন কিছু ভাই; অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানের কিছু অপরিণামদর্শী আলিমও এমনটা মনে করেন যে—প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে মুতাওয়ারাস ধারাটির আর দরকার নেই। ইলম আজ অতি সহজলভ্য। গোটাকয়েক আর্টিকেল আর ডজনকয়েক হাদিসগ্রন্থ মুতালাআ করে নিলেই গবেষক বনে যাওয়া যাবে। ইলমের সাথে সম্পর্ক রাখেন এবং ইলমের মুতাওয়ারাস ধারা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন—এমন ব্যক্তিমাত্রই দুঃখিত ও ব্যথিত হন এইসব কথায়। বর্তমান ফিতনার যুগে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী জেনারেল ভাইদের শ্রেণিটিকে নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর মানসিক টানাপোড়নের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার পিছনে কিছু ভাইদের এই মানসিকতা অনেকাংশে দায়ী। রিজালের সাথে সম্পর্ক বাদ দিয়ে বিভিন্নধর্মী বই ও দ্বীনী পুস্তক পড়ে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন সম্পর্কে জানার প্রবণতা ও গবেষক বনে যাবার বাসনা খুবই ভয়ংকর ও আত্মঘাতী চিন্তা।

এই কর্মপন্থাকে স্পষ্ট ভুল আখ্যায়িত করে মুফাক্কিরে ইসলাম আলি নদভি আক্ষেপ করে লিখছেন—“কিন্তু দুঃখজনক যে-ভুলটি ঘটেছে তা হলো—মানুষজন ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে কিতাবের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বসে আছে। বইপুস্তককে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে তুষ্টিতে ভুগছে। এতে ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তা হলো—দ্বীন শেখা একটি কঠিন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ইলম শেখার পরিধি হয়ে গেছে অত্যন্ত সীমিত। দ্বীনের ইলম থেকে বঞ্চিত হয়েছে পেশাজীবী ও কর্মব্যস্ত মানুষজন; তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। দ্বীন শেখার সুযোগ হচ্ছে কেবল উম্মাহর গুটিকতক মানুষের; যারা ইলমের জন্য নিজেদেরকে জীবন থেকে ফারোগ করতে পেরেছে। ফলে, ইলম ক্ষুদ্র ও নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির মাঝে সীমিত হয়ে পড়েছে। আর উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ ডুবে রয়েছে অজ্ঞতা ও হতাশায়...”। (২৭)

এটি অত্যন্ত আশার কথা যে—জেনারেল ভাইদের মধ্যে ইসলামি চিন্তাচেতনা ও বোধের জাগরণ ঘটছে। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু এই আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে যদি যথাযথভাবে দ্বীন শেখার পথে ব্যবহার না করা যায়, তাহলে –আল্লাহ মাফ করুন- হিতে বিপরীত হতে পারে। উপমহাদেশের মুফতিয়ে আ’যম মুফতি শফি রহ. অত্যন্ত দরদের সাথে এই চিন্তার গোঁড়ায় হাত দিয়ে সতর্ক করেছেন।

পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে বলেন—“প্রথম দুর্বলতা চিন্তাগত। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ভাইদের মধ্যে ইসলাম ও ইসলামিয়াত সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কিছু ভুলের কারণে তাঁদের লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়ে যায় বেশি এবং হেদায়েতের পরিবর্তে সূচনা হয় ফিতনার। একটি ভুল এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত অধ্যয়নই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো—জগতের কোনো বিদ্যা কি শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা অর্জিত হয়? এমন একটি দৃষ্টান্তও কি দেখানো যাবে যে, শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা কেউ কোনো শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে? তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর ইলম কীভাবে এত তুচ্ছ হয়ে গেল যে, কিছু বইপত্র পড়েই এ বিষয়ে পণ্ডিত হওয়ার আশা করি? আমরা যদি সত্যিই কুরআনের ইলম অর্জনে আগ্রহী হই তাহলে শুধু নিজস্ব পড়াশোনা দ্বারা নয়; বরং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নিয়মানুযায়ী শিখতে হবে এবং নিজস্ব ধারণার ওপর তাঁদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতে হবে”। (২৮)

সারকথা এই যে, শুধু কিতাবের ওপর নির্ভর করে দ্বীন শেখা ও ইলম অর্জনের সুযোগ নেই। বরং রিজালের সুহবতে কিতাবের সাহায্যে ইলম ও দ্বীন শিখতে হবে।

বই বা কিতাব অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও আছে বেশকিছু শর্ত। তার কিছু উল্লেখ করেছেন আল্লামা আবু ইসহাক শাতিবি, আর কিছু উল্লেখ করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিয়াহুল্লাহ। শর্তগুলো দিয়ে লেখা শেষ করছি।

ইমাম শাতিবি লিখেছেন—“কিতাব পাঠও ইলমের জন্য উপকারী। তবে দুটি শর্তে। এক. কাঙ্ক্ষিত ওই শাস্ত্রের মাকাসেদের ‘ফাহম’ তথা বুঝ অর্জন করা, সেই শাস্ত্রের শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষা জ্ঞাত হওয়া; যাতে করে কিতাব পড়ে বুঝতে পারে। আর এটা অর্জন করতে হয় আলিমদের যবান থেকে সরাসরি বা এইরকম কোনো পদ্ধতিতে। এটাই পূর্বোক্ত কথাটির মর্ম—‘ইলম এককালে ছিল রিজালের অন্তরে; পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে গেছে কিতাবের পাতায়। তবে কিতাব খোলার চাবি রয়ে গেছে রিজালের হাতে’। কোনো আলিম উন্মোচন করে না দিলে কিতাব এককভাবে কোনো ছাত্রের সামান্যতম উপকার করতে পারে না। দ্বিতীয় শর্তটি হলো—উদ্দিষ্ট শাস্ত্রবিদগণের মধ্য থেকে মুতাকাদ্দিনের কিতাব অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ, পরবর্তীদের তুলনায় পূর্ববর্তীরা ইলমের অধিক নিকটবর্তী”। (২৯)

একটি কিতাব কীভাবে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে? এর মূলনীতি বলে দিয়েছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিয়াহুল্লাহ। এক্ষেত্রে মুহতারামের কথাগুলো সামনে রাখা অতীব জরুরি। তিনি লিখেছেন—“স্পষ্টতই, দ্বিনী কিতাব নামে কেউ কোনো কিতাব লিখলেই তা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে—ব্যাপারটি এমন নয়। কোনো কিতাব নির্ভরযোগ্য ও পাঠকের উপযোগী হওয়ার জন্য দু’টি মৌলিক শর্ত

রয়েছে—

১. গ্রন্থকার বা সংকলক সুন্নতের অনুসারী ও সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া। যে লোক আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের ‘মুতাওয়ারাছ আকীদা’(৩০) ও ‘মুতাওয়ারাছ ফিকর’(৩১) থেকে সরে গিয়ে ‘শুযূয’ (বিচ্ছিন্ন মত) অবলম্বন করেছে কিংবা যে লোক শরীয়তের পাবন্দ নয় তার রচিত বই সাধারণ পাঠকের পাঠযোগ্য নয়।

২. গ্রন্থে উল্লেখকৃত বিষয়াদি সামষ্টিক বিচারে ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া। মানবরচিত কোনো গ্রন্থে কোন ধরনের ভুলত্রুটিই থাকবে না—এটা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই কোনো গ্রন্থ পাঠের ব্যাপারে এই শর্তারোপ করা যায় না যে, তাতে কোন ভুলত্রুটি থাকতে পারবে না।... এ কারণে এ ক্ষেত্রে শরয়ী উসূল হল, লেখক যদি শরীয়তের পাবন্দ ও সহীহ আকীদার অধিকারী হন, লেখায় কোনো ‘ফিকরী শুযূয’ (বিচ্ছিন্ন চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ) অবলম্বন না করে থাকেন এবং তার গ্রন্থটি সামষ্টিক বিচারে সহীহ ও সঠিক হয় অর্থাৎ সে গ্রন্থের মৌলিক বার্তা সঠিক হয়, তাতে বড় ধরনের ভুলত্রুটি খুব বেশি পরিমাণে না থাকে তাহলে সে গ্রন্থকে নির্ভর করার মত গ্রন্থ গণ্য করা হবে। এ গ্রন্থ পড়তে মানুষকে নিষেধ করা হবে না। তবে সে গ্রন্থের নির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা বা নির্দিষ্ট কোনো মত সম্পর্কে যদি প্রমাণিত হয় যে, তা ইনসাফের অধিকারী এবং সব বিষয়ে সঠিক ও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জুমহূর (অধিকাংশ) আহলে ইলমের মতে মুনকার(৩২) ও গলদ, তাহলে সেই রেওয়াজে বা সেই মত অবলম্বন করা ঠিক হবে না। গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে যেমন এই মুনকার রেওয়াজে বা মত গ্রহণ করা ঠিক হবে না, তেমনি এ কারণে গ্রন্থ একেবারে বর্জন করাও ঠিক হবে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শরয়ী মূলনীতি”। (৩৩)

সুতরাং দ্বীন ও ইলমে দ্বীন শেখার মুতাওয়ারাস ও মৌলিক পন্থাটির সহায়ক পন্থা হলো কিতাব ও দ্বিনী গ্রন্থ পাঠ করা। তবে তাও হতে হবে উপরোক্ত শর্তাবলির বিচারে উত্তীর্ণ। নয়ত তা হতে পারে ফিতনার কারণ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফায়ত করুন এবং সহীহ ও মুতাওয়ারাস পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করার তাওফিক দান করুন।



সূত্রসমূহ :

- (১) মাজমু'আতু রাসাইলিল ইমাম গাযালি, ইলম-অর্জনের পদ্ধতির আলোচনা, পৃষ্ঠা-২৩০; দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.
- (২) সুরা নাহল, আয়াত-৪৩
- (৩) সুরা বাকারা, আয়াত-১২৯
- (৪) তাফসিরে তাবারি ৩/৮৩-৮৬, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪২০ হি.
- (৫) সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৯; মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং-২৪৫৮
- (৬) সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং-১৪৩১, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.
- (৭) মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়াতিল মুআছিরাহ, ২/১৫৪২, আলামুল কুতুব, প্রথম সংস্করণ ১৪২৯ হি.
- (৮) তাভুল আরুস, মুরতাযা যাবিদি, ৩৩/১২৮, দারুল হিদায়াহ
- (৯) বুখারি, পৃষ্ঠা-১৮, দার ইবনে হাযম, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩০ হি.
- (১০) লিসানুল আরব, ইবনে মানযুর, ১/২৪৪, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ
- (১১) মাউসুআতুন নাহবি ওয়াস-সারফি ওয়াল-ই'রাব, ড. আমিল বাদি' ইয়াকুব, পৃষ্ঠা-১৬৮
- (১২) ফাতহুল বারি ১/১৬১, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, সংস্করণ-১৩৭৯ হি.
- (১৩) মুসনাদে বাযযার ৫/৪২৩, হাদিস নং-২০৫৫; মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, প্রথম সংস্করণ। আল-মু'জামুল কাবির ১৯/৩৯৫, হাদিস নং-৯২৯; মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ
- (১৪) ফাতহুল বারি ১/১৬১, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, সংস্করণ-১৩৭৯ হি.
- (১৫) আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকাল্লা-তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১-১৩২, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.
- (১৬) সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা-২০; দার ইবনে হাযম, কায়রো। হুসনুল মুহাযারা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরা, সুয়ুতি, ১/১৫৭; আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়াহ, মিসর। আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস, বাগদাদি, পৃষ্ঠা-১১০, তাহকিক-নুরুদ্দিন ইতর
- (১৭) আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস; খতিব বাগদাদি ৪৬৩হি.; পৃষ্ঠা-৭৮; দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫ হি। শব্দের সামান্য পার্থক্যসহ ঘটনাসম্মেত হাদিসটি বর্ণিত আছে-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৬৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৩
- (১৮) মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ রচিত 'এসব হাদীস নয়-২'-এর শুরুতে লিখিত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিয়াহুল্লাহর ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১৬, প্রথম সংস্করণ ১৪৩৮ হি.
- (১৯) মাজমু'আতু রাসাইলিল ইমাম গাযালি, ইলম-অর্জনের পদ্ধতির আলোচনা, পৃষ্ঠা-২৩০; দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.
- (২০) আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকাল্লা-তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.
- (২১) তাবয়িযুস সাহিফা, পৃষ্ঠা-১২৯, হাফেয সুয়ুতি, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান, সংস্করণ-১৪১১ হি.
- (২২) আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফা লিবায়ানি মাশহুরি কুতুবিস সুন্নাতিল মুশাররাফাহ, পৃষ্ঠা-৭, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-কাত্তানি, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ, অষ্টম সংস্করণ, ১৪৩০ হি.
- (২৩) সুলতান আলপ আরসালান, ইমরান রাইহান, দারুল ওয়াফা, প্রথম সংস্করণ, একুশে বইমেলা-২০২০
- (২৪) আল-মুওয়াফাকাত ১/৬৪, ইমাম শাতিবি; দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি। ঈশৎ সংক্ষেপিত।
- (২৫) সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১০০
- (২৬) আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকাল্লা-তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.
- (২৭) আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকাল্লা-তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩২, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.
- (২৮) তালিবানে ইলম : পথ ও পাথেয়, পৃষ্ঠা-২৫৮, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিয়াহুল্লাহ; কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি-মুফতি শফি রহ.; মাকতাবাতুল আশরাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৩ হিজরি
- (২৯) আল-মুওয়াফাকাত ১/৬৮, ইমাম শাতিবি; দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.
- (৩০) "যুগ পরম্পরায় চলে আসা দলিলসিদ্ধ ও স্বীকৃত ইসলামী আকীদা"।
- (৩১) "দ্বীনের সেই মৌলিক বোধ ও রুচি-প্রকৃতি, যা যুগ পরম্পরায় দ্বীনের ধারক-বাহকদের মাধ্যমে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছেছে"।
- (৩২) "এখানে মুনকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল শাস্ত্রীয় বিচারে তার 'নাকারাত' এত বেশি যে, তাকে 'মাতরহ' বা 'মওয়ূ'-এর কাতারে ফেলতে হয়"।
- (৩৩) মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ রচিত 'এসব হাদীস নয়-২'-এর শুরুতে লিখিত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিয়াহুল্লাহর ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১৬-১৭, প্রথম সংস্করণ ১৪৩৮ হি.

#ইলম_অর্জনের_মুতাওয়ারাস_পদ্ধতি

ইসলামে মধ্যপন্থা বনাম মডারেটিজম

হুজাইফা প্রাওয়াদ

আমার এক শ্রদ্ধেয় বেশ কিছুদিন যাবৎ অনলাইন অফলাইনে কুরআনে কারীমের 'وسط' (মধ্যপন্থি) শব্দটিকে মডারেট (moderate) অর্থে যত্রতত্র ব্যবহার করছেন। শুধু তিনিই নন, ওয়েস্টার্ন লিবারেল চিন্তার ছত্রছায়ায় যারা নিজেদেরকে সেবাদাস হিসেবে হাজির রাখতে পছন্দ করেন, তাদের সবার চিন্তা এমন যে - ইসলামিক আইডিওলজির একটা নির্দিষ্ট 'দালাহাহ' (connotations) ধারণ করে- এমন সব শব্দকেও নিজের চাহিদা মাফিক ব্যবহার করলে সেটা ইসলামাইজড হয়ে যায়।

শাব্দিক অর্থে 'ওয়াসাত' এবং 'মডারেট' দুটি শব্দ কাছাকাছি। তবে, একথা মনে রাখতে হবে, যে সকল শব্দকে শরিয়াহ তার মাখসুস (বিশেষায়িত) অর্থে ব্যবহার করেছে, এখন সেসব শব্দকে স্রেফ শাব্দিক অর্থের সাথে মিল আছে বলেই নিজ খেয়ালখুশি মত ব্যবহার করা শরিয়াহর স্পষ্ট তাহরীফের (বিকৃতি) শামিল। ইসলামে 'মধ্যপন্থা'

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের বেঁধে দেওয়া সংজ্ঞায় নিরূপণ হয় না, এটা নিরূপিত হয় ইসলামিক নিজস্ব মাফাহিম কিংবা কন্সেপশনাল ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে। অর্থাৎ, ধরা যাক, কেউ ভাস্কর্যের পক্ষে ইনিয়ে বিনিয়ে সাফাই গেয়ে মূর্তি-ভাস্কর্যের পার্থক্য গুলো চিহ্নিত করার কোমল কসরত করল। এতে যদিও সেক্যুলার গোষ্ঠির 'গোড়া ক্যাথলিক, এক্সট্রিমিস্ট, রেডিক্যাল মুসলিম' এর তকমা থেকে সে বেচে যায়। বরং একজন সাচ্চা 'মধ্যপন্থী' মুসলিম বুদ্ধিজীবী আলিম হিসেবে মিডিয়া তাকে হাজির করে; কিন্তু তার এই মধ্যপন্থাকে ইসলাম ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলতে নির্দেশ করে।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে বলছেন, আমরা যেন তার দ্বীনকে বলিষ্ঠ ভাবে আঁকড়ে ধরি। এবং এটা বিশ্বাস করি যে, তার রাসুল সাঃ যা নিয়ে এসেছেন তা ধ্রুব সত্য, যার মাঝে সন্দেহের লেশ মাত্রও নেই। এবং দ্বীনের বিপরীতে যা কিছু আছে, তা

বাতিল ও স্পষ্ট ভ্রষ্টতা বৈ কি। কিন্তু পশ্চিমের কাছে মডারেট মানহাজের একজন গুড মুসলিমের পরিচয় হলো, যে তার ধর্মের ব্যাপারে শিথিল ও মুদাহিন তথা মোসাহেবি চাটুকার। সে ততটুকুই প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে, যতটুকু বললে তার উপর রেডিক্যাল তকমা লাগবে না। প্রয়োজনে কালচারাল, পলিটিক্যাল ও ইকোনমিক্যাল ইন্টারেস্টের সামনে নিজের অকাট্য ধর্মকেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে দ্বিধা হবে না।

তাহলে, ইসলামে 'ওয়াসাত' এর কনসেপ্ট কী? ওয়াস বলতে শরিয়াহ বুঝায়, এমন সব ব্যক্তিকে, যারা দ্বীন নিয়ে সর্বাঙ্গায় গর্বিত। সালাফ তথা সাহাবাদের আদর্শে আদর্শবান। সত্য সাক্ষ্য দিতে আপোষ করে না। অর্থাৎ, কুফরকে কুফর বলতে দ্বিধা সংশয়ে ভোগে না। তবে এসব ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও অনধিকার চর্চাকেও প্রশ্রয় দেয় না। ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য যা যা করা প্রয়োজন, করে। জালিম ছাড়া সবার সাথে উত্তম ভাষা ও আদর্শ পন্থায় দাওয়াত দেয়। একই সাথে এটা বিশ্বাস করে যে, যেমন প্রয়োজন কিতাবুল্লাহ, তদ্রূপ সাথে সাথে প্রয়োজন 'আস সাইফুন নাসির'। মোটকথা মুদাহানা, তামাইয়, খুয়ু', ইসতিকানা ও তাশাদ্দুদ; তথা ভুল জায়গায় তরলতা, চাটুকারিতা, বশ্যতা ও অতি রঞ্জন থেকে মুক্ত জামাতকেই শরিয়াহর পরিভাষায় 'ওয়াসাত' বলা হয়।

আর এইসব গুলো বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে দেখতে চাইলে সাহাবা কেলামের জীবন ও কর্মকে সামনে রাখতে হবে। এজন্য ইবনুল কায়্যিম রাহঃ বলেন: কোন ব্যক্তি সাহাবাদের চিন্তা ও কর্ম বিরোধী কোনো কাজ করলে আমরা বলবো, এটা সত্য হলে অবশ্যই সাহাবা কেলাম এটার দৃষ্টান্ত রেখে যেতেন। (মর্ম)(১)

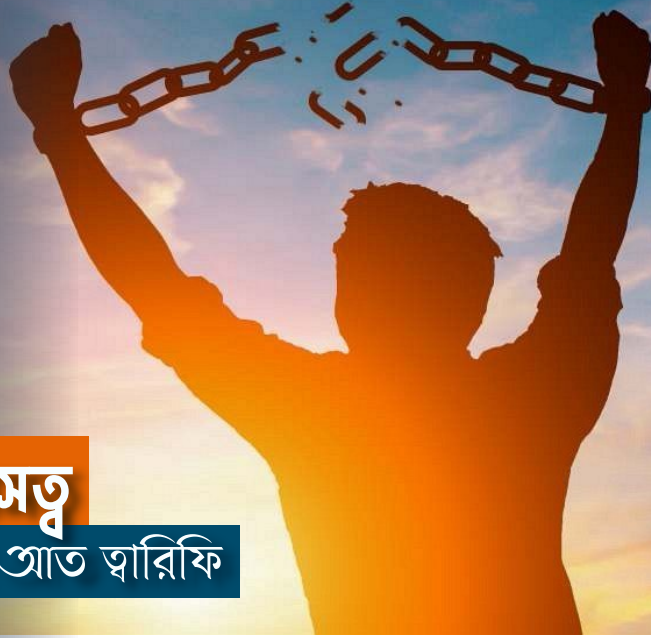
অতএব, কোনো শব্দ কিংবা চিন্তাকে শুধুমাত্র অর্থগত মিল থাকার কারণে পশ্চিমা মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ করে সেটাকে শরিয়াহ হিসেবে ব্যাখ্যা করা স্পষ্ট তাহরীফ। বিশেষত যে সকল ব্যাপার উসুলুদ দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে অবশ্যই অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। নিজের ঈমানের মূল্য নিজের কাছে না থাকলে, এমন সব চিন্তার ভিখারি হয়েই ফিরতে হবে আজীবন।

وما علينا إلا البلاغ

(১)-

فإن الحق لا يعدوهم و(لا) يخرج عنهم إلى من بعدهم قطعاً، ونحن نقول لمن خالف أقوالهم: لو كان حقاً ما سبقونا إليه (ই'লামুল মুয়াক্কিমিন- 4/166)





স্বাধীনতা এবং দাসত্ব

শায়খ আব্দুল আজিজ আত হারিফি

source: islāmhouse.com

স্বাধীনতার প্রকৃতি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া
অপর সকলের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে
মুক্ত থাকা। স্বাধীনতা দ্বারা যদি আল্লাহর
আদেশ-নিষেধ থেকে বের হয়ে যাওয়া
অনুধাবন করা হয়, তবে তা হবে আত্মার
পৌত্তলিকতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব। আল্লাহ
বলেন,

أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوِيَهُ وَ
أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَىٰ
سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ
غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

[الجاثية: 23]

“তবে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন তাকে,
যে তার প্রবৃত্তিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে
নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার
পর আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং
তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে
দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের ওপর
রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর
পরে কে তাকে হেদায়াত দিবে? তবুও
কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?”

[সূরা আল-জাসিয়াহ, আয়াত: ২৩]

আর কেউ যদি মানুষের জন্য যা ইচ্ছা,
যেভাবে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা করা বা বলার
অনুমোদন দেয়, তবে সে তার প্রবৃত্তি ও
শয়তানের দাসত্বেরই স্বীকৃতি দিল।
কারণ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দাস
হিসেবে; সে যদি আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ না
করে, তবে অন্যের দাসে পরিণত হবে-
নিঃসন্দেহে!

আর যদি দুনিয়াতে শুধু একটি লোক
থাকত, তাহলে আল্লাহ তার ওপর হত্যা,
অপবাদ, ব্যভিচারের শাস্তি অবধারিত
করে দিতেন না, অনুরূপভাবে তার ওপর
নির্দেশনা থাকত না লজ্জাস্থানের দিকে
তাকানো থেকে চোখ বন্ধ করার, তেমনি
থাকত না মীরাসের বিধি-বিধান, তার
ওপর হারাম করা হতো না ব্যভিচার, সূদ
ইত্যাদি। আল্লাহ তো তখনই এ
বিধি-বিধানগুলো দিয়েছেন, যখন সেখানে
তারই জাতিভুক্ত অন্যরা রয়েছে। সংখ্যায়
যখন অন্যরা বেশি হয়, তখনই জীবনে
নিয়ম-শৃঙ্খলা বেড়ে যায়। যদি আকাশে
কেবল চাঁদই থাকত, তবে আল্লাহ তাকে
এই নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিয়ন্ত্রণ করতেন

না, কিন্তু তিনি করলেন সূর্য, যমীন ও গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমনের সাথে সঠিকভাবে চলার স্বার্থেই। অনুরূপভাবে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা যত বেড়ে যায়, ততই এগুলোর শৃঙ্খলাও বেড়ে যায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

তিনি আরও বলেন, “সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৪০]

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিধি-বিধান দীন ও দুনিয়া উভয়টিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রণীত হয়েছে। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর বিধান থেকে বের হতে চাইবে, সে তাঁর শাস্তির হকদার হবে।

ইসলামে প্রবেশ করা আবশ্যিক, আর ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ মুরতাদ হওয়া- “আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৭]

তাছাড়া সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কেউ তার দীন পরিবর্তন করবে তাকে তোমরা হত্যা করবে।”

বস্তুতঃ আল্লাহর দাসত্ব হচ্ছে সৃষ্টি ও অস্তিত্বের মূল লক্ষ্য। যে ব্যক্তি এর থেকে বের হওয়া বৈধ মনে করবে, সে অস্তিত্বের মূল লক্ষ্যের প্রতি-ই ঈমান আনে নি। সে কিন্তু কোনো রাষ্ট্র বা আইন প্রভৃতি দুনিয়ার নিয়মনীতির বাইরে চলা বৈধ মনে করে না, অথচ আল্লাহর দাসত্ব থেকে বের হওয়া বৈধ মনে করে! এটা সৃষ্টির অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা অথবা অন্তর থেকে এ বিশ্বাস একেবারেই উধাও হয়ে যাওয়ার-ই গোপন স্বীকৃতি। অথচ আল্লাহ বলেন, “আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

যে সত্ত্বা মানুষ ও জিনকে দুনিয়াতে তাঁর ইবাদতের জন্য অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি আখিরাতে তাদেরকে তাঁর হিসাব, সাওয়ার ও শাস্তির জন্য অস্তিত্বে নিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের অবস্থা ও পরিণাম পরিশুদ্ধ করে দিন। দুর্জাদ ও সালাম নাবীর ওপর
এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর।

বিজ্ঞাপন



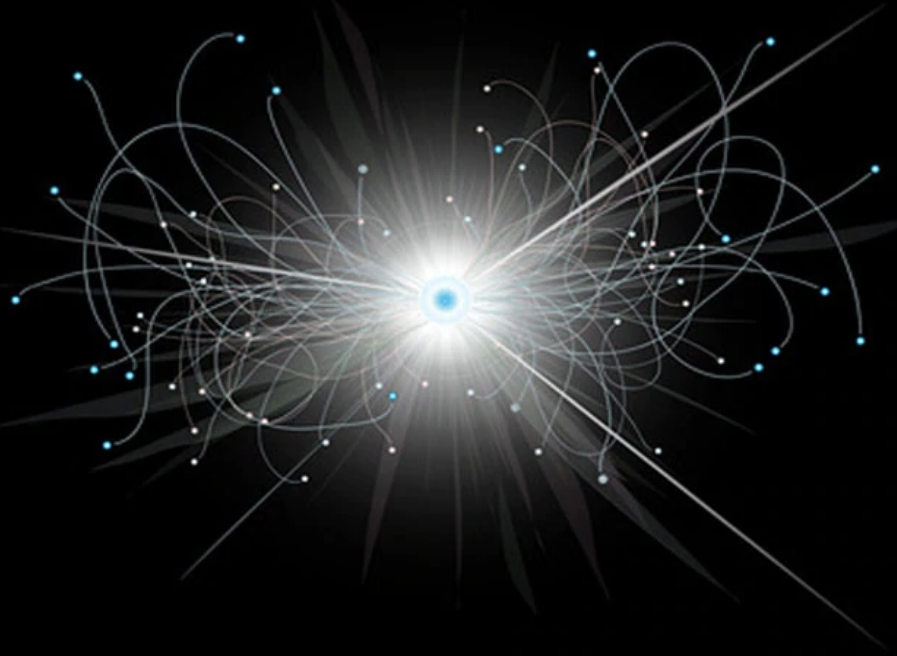
বিজ্ঞাপন



বিজ্ঞান আমার ঐমান নাড়িয়ে দিয়েছে

মূল : হামযা জর্জিস

অনুবাদ : নিয়াজ আহমদ খান



সন্দেহের প্রথম প্রকার, যাকে বলি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকারের সন্দেহ। এটি সাধারণত বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় অথবা যারা বিজ্ঞান পছন্দ করে তাদের থেকে আসে কারণ আমরা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের যুগে বাস করি। যাইহোক, ইসলাম বিজ্ঞান ভালোবাসে। পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম বিজ্ঞানী ইবনে আল হাইথাম, যিনি ছিলেন একজন মুসলিম। যদি আপনি তাঁর জীবনীমূলক রচনাগুলি পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন উনার বড় দাড়ি ছিল, মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ। এবং তিনি একজন ইবাদতগোজার ব্যক্তি ছিলেন, একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি বিজ্ঞানচর্চা করি কারণ আমি কেবল আল্লাহ সুবহানাল্ ওয়াতালার ইচ্ছা সৃজনশীল বিশ্বে খুঁজে পেতে চাই।’ তাই লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

বিজ্ঞান এখন প্রায় সামাজিক ঘটনার মতো। এটা যেন সবকিছুর জন্য একটা মাপকাঠি হয়ে গেছে। দৈনন্দিন প্রতিটা কাজ এখন এটি করে দিচ্ছে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ধর্মের মতো হয়ে উঠছে, কারণ এটি কাজ করছে। স্পষ্টতই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রদায় এখন জানে যে, যদি কিছু কাজ করে তার মানে এই নয় যে এটি সত্য, এবং তারা এটাও জানে যে বিজ্ঞানের নিশ্চিততার প্রয়োজন নেই। তারা জানে যে ইহা সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং বিজ্ঞানের প্রতিটা তথ্য সর্বদা পরিবর্তন-পরিবর্ধন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, হিউ রোচের বিজ্ঞানের দর্শনের উপর যেকোনো বই পড়ুন। অথবা অ্যালেক্স রোজেনবার্গ বা স্ট্যাথিস সিলোস বা এলিয়ট সোবারের, এরা হলেন বিজ্ঞানের মূলধারার দার্শনিক যাদের লিখা আপনি স্নাতকোত্তর আর অস্নাতকে পড়েছেন। তারা বলেন যে এখানে কোনো নিশ্চিততা নেই। আপনি যদি নিশ্চিত হতে চান, অন্য কোথাও যান। এটা বিজ্ঞানে নেই।

বিজ্ঞান অসাধারণ, এটা সুন্দর কাজ করে। আমরা এটা ভালোবাসি। এটা মূলত কাজের সাধনী, এটাই বিজ্ঞানের প্রকৃতি। কিন্তু আজকাল যা ঘটছে তা হল আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক উপসংহার শুনে পাগল হয়ে যাই। অনেক মুসলিম ভাই আমায় ই-মেইল

পাঠায়, ‘ও ভাই! ওরা ঈশ্বর কণা (God Particle) খুঁজে পেয়েছে, আমার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ছে..’ আর আমি হতবাক হই, হয় আল্লাহ এই লোকটা কি বলছে! একটি জনপ্রিয় ম্যাগাজিন শিরোনাম দিয়েছিল ‘God Particle Found’ যাকে হিগস বোসন (Higgs Boson) বলা হয়। আর ঐ জিনিসটা উনার ঈমান ভেঙ্গে দিচ্ছে। তিনি বিজ্ঞানসংক্রান্ত কোনো পত্রিকা পড়ার কষ্ট করেননি, যেখান থেকে জানতে পেরেছিলেন সেটা ছিল একটা জনপ্রিয় ম্যাগাজিন। হিগস বোসন কী তা উনার কোনো ধারণা ছিল না। কেউ বলেছে, ‘আপনি জানেন, একজন বিজ্ঞানী বলেছেন তারা ঈশ্বর কণা খুঁজে পেয়েছে।’ আর এটা শুনেই উনার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ছে, এটা হাস্যকর। একেবারে হাস্যকর। এটা প্রকাশ করে আমরা আমাদের চিন্তার স্তরকে কতটা নিলম্বিত করে ফেলেছি।

আপনি কি জানেন হিগস বোসন কি? আমি বুঝিয়ে বলছি, সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে একটি ক্ষেত্র। একটি কণা সেই ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে ও ভরলাভ করে। ওই বিশেষ ক্ষেত্রকে বলা হয় ‘হিগস ক্ষেত্র’ এবং ওই ক্ষেত্রের একটি কোয়ান্টা/কণাকে বলে ‘হিগস বোসন’। হিগস কণাকে নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য বই লিখলেন পদার্থবিদ লিও লেডারম্যান। বইয়ের নাম দিলেন “God Particle: If the Universe is the answer, what is the question?” প্রথমে বিজ্ঞানী কিন্তু তার নাম “হিগস বোসন”-ই রেখেছিলেন। প্রকাশক ওইরকম খটোমটো নামে অরাজি। বেশ কয়েকবার নাম বদলানোর পরেও প্রকাশকের পছন্দ না হওয়ায় ক্ষেপে গিয়ে বিজ্ঞানী নাম দিয়ে বসলেন “Goddamn particle” অর্থাৎ “দূরছাই কণা”। প্রকাশক কি করলেন? “damn” টুকু বাদ দিয়ে সেটাকে করে দিলেন “God particle”। এইরকম নাম কি জনপ্রিয় না হয়ে যায়? সেই থেকে সাধারণ মানুষ ও গনমাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভরপ্রদায়ী কণা হয়ে গেল “ঈশ্বরকণা” বা “God Particle”। এটার সাথে দূরদূর পর্যন্ত স্রষ্টার সম্পর্ক নেই, না এটা অস্বীকার করে আল্লাহ আছেন না নিশ্চিত করে।

আমি যে কারণটি উল্লেখ করছি, এটি দেখানোর জন্য যে বিজ্ঞান কখনই আল্লাহকে অস্বীকার করবে না, কখন করতেও পারবে না। আপনি যদি বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে জানতে পারবেন প্রফেসর এলিয়ট সোবারের মতে, বিজ্ঞান কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সমাধান করতে পারে যা পর্যবেক্ষণগুলি সমাধান করতে পারে। আল্লাহর সংজ্ঞা অনুসারে, তিনি অধিবৈদ্যিক ধারণা অর্থাৎ তিনি পর্যবেক্ষণমূলক নন, **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**। প্রশ্ন আসে আল্লাহ মহাবিশ্বের ভিতরে নাকি বাইরে? মহাবিশ্বের বাইরে। যদি আমি একটি টেবিল তৈরি করি, আমি তো টেবিল হয়ে যাই না। আমি একজন ছুতার হলে টেবিল তৈরি করতে পারি। তাহলে আমি কি টেবিল হয়ে যাই? না। আমি টেবিল থেকে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন, যেমনটি ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে সৃষ্টি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাল্লা থেকে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন। **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**। আল গাজ্জালী

একই কথা বলেছেন, আমাদের সকল উলামায়ে কেলাম একই কথা বলেছেন, মানে মূলধারার উলামারা যারা। তাই বিজ্ঞান কখনোই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতালাকে সরাসরি নিশ্চিত বা অস্বীকার করতে পারে না। কেন? কারণ এটি কেবলমাত্র সেই বিষয়েই সমাধান করতে পারে যা পর্যবেক্ষণগুলি সমাধান করতে পারে।

আরেকটু বিশ্লেষণ করি, ধরুন দুইটা রুম আছে। আমি জানি এই ঘরে কি আছে, কিন্তু পাশের ঘরে কি আছে জানি না। আমি এই ঘরে একটি কার্পেট দেখতে পাচ্ছি এইটার উপর যুক্তি দাঁড় করিয়ে অপর ঘরের কথা বলতে পারি না যে অন্য ঘরে কার্পেট নেই। সুতরাং আপনি যদি একজন বিজ্ঞানী হতে আসেন এবং আপনি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে চান, তবে এটি দুটি ঘর থাকার সমতুল্য। আপনি জানেন না অন্য ঘরে কি আছে, আপনি একটি ঘরে আছেন এবং আপনি এই ঘরে একটি কার্পেট দেখতে পাচ্ছেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পাশের ঘরে কোনো কার্পেট নেই। এটি একটি যৌক্তিক ভ্রান্তি। এর কোন যৌক্তিকতা নেই। এটি ননসেন্সের অর্থাৎ এটি যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করে না। খুব সম্ভবত হিউ রোচ বলেছিলেন, তিনি মূলত পরামর্শ দেন যে বিজ্ঞান নাস্তিকতাকে সমর্থন করে। উচ্চ নম্বর জুটে উদ্দীপনার জন্য আর যুক্তির জন্য কম। যেকোনো অকপট বিজ্ঞানকেন্দ্রে যান, কাতার ফাউন্ডেশন অথবা এডুকেশন সিটি অথবা অক্সফোর্ড অথবা কেমব্রিজ, এবং একজন অকপট বিজ্ঞানী এবং একজন বিজ্ঞানের দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করুন, বিজ্ঞান কি কখনও সরাসরি স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারে? উত্তর আসবে না, পারবে না। কারণ তিনি অধিবৈদ্যিক ধারণা। আপনি যা পর্যবেক্ষণ করেন তা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতালাকে অস্বীকার করতে পারে না। বিজ্ঞান যে কয়টা জিনিস করতে পারে তা হলো, প্রথমত বিষয়টিতে নীরব থাকা। দ্বিতীয়ত কিছু প্রমাণাদি সামনে আনা যা থেকে আপনি অনুমান করতে পারবেন একজন নির্মাতা আছেন। কিন্তু এটা সরাসরি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতালাকে অস্বীকার করতে পারে না। বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা কেউ যাই বলুক না কেন সরাসরি স্রষ্টা অস্বীকার করতে পারবে না।

ইনভিকটাস স্টেনগার নামের একজন আছে। সে একটি বই লিখেছিল, 'ব্যর্থ হাইপোথিসিসঃ কিভাবে বিজ্ঞান স্রষ্টাকে অস্বীকার করে', এটি এত হাস্যকর বই, কি আর বলব। বিজ্ঞান কখনই স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারে না। এটি যা করতে পারে তা হল সৃষ্টি কীভাবে বিকশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য বিকল্প কৌশল বর্ণনা দেওয়া, কিন্তু এটি একটি ভিন্ন আলোচনা। তাই না? এটি সৃষ্টির গল্পকে অস্বীকার করছে। এটা অস্বীকার করছে কিভাবে প্রজাতি বিকশিত হয়েছে বা প্রজাতির বিবর্তনের জন্য ভিন্ন ধরনের আখ্যান বা ভিন্ন তত্ত্ব নিশ্চিত করছে। এটি একটি ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু মহাবিশ্বের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তাকে সরাসরি অস্বীকার করা। এটা অসম্ভব। বিজ্ঞান কিছুতেই তা মোকাবেলা করতে পারবে না।

মিথ্যা

মিথ্যা

মূল : শায়খ আহমদ মুসা জিব্রীল

অনুবাদ : আম্মারুল হক

যে মিথ্যা বলে সে কেবল মিথ্যাবাদীই নয়। বরং একজন মুনাফিকও।

মিথ্যা হল মন্দের চাবিকাঠি। কেউ কোনো অন্যায় করলেও মিথ্যা বলবেনা। যেমন, একটি মেয়ে আজ ডেটিংয়ে গেলো। রাত ১টার দিকে সে ফেরার পর তার জানতে চাইলেন, 'তুমি কোথায় ছিলে?' সে বলে, "এক বন্ধুর বাড়িতে"। এটা বলার দরকার নেই। তাকে সত্য বলায় অনুপ্রাণিত করুন। ছেলেরা সত্যি কথা বলুক। সে রাতে যেখানেই থাকুক না কেন, মন্দ কাজ যাই করুক, সত্য বলে ফেলুক। সত্যই আপনাকে মন্দ থেকে বিরত রাখবে। কোথাও ঘুরতে গেলে বা কোনো পাপকাজে গেলে লুকোবেন না। আপনি আপনার পাপের কথা আপনার কাছে লোকদের কাছে প্রকাশ করতে না চাওয়া মানে আপনি মিথ্যার বুনিয়াদ গড়তে যাচ্ছেন। মিথ্যা আপনাকে মুনাফিক বানিয়ে ছাড়বে। আল্লাহ বলেছেন,

ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين

'যেন আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সততার বিনিময় এবং
মুনাফিকদের শাস্তি দান করেন।'

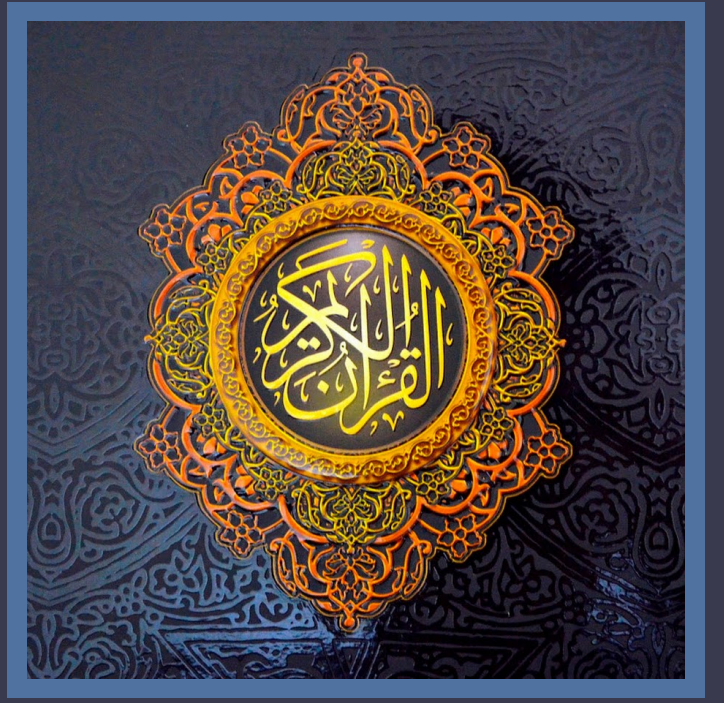
[সূরা আল আহযাব: আয়াত ২৪]

কেন তিনি একজন মুনাফিককে একজন সত্যবাদীর বিপরীতে উল্লেখ করেছেন? আল্লাহ এই বিষয়টিই আপনাকে দেখানোর জন্য এই তুলনা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলছে সে কেবল মিথ্যাবাদী নয়, সে একজন মুনাফিক!

দরসগাহ স্পেশাল
ধারাবাহিক সিরিজসমূহ

কুরআনিষ্ট মতবাদের সূচনা ও ইতিহাস এবং তাদের ভ্রান্তি

উস্তাদ আম্মারুল হক



আহলে কুরআন বা কুরআনিষ্ট বলতে মোটাদাগে তাদেরকেই বুঝায় যারা সাধারণত হাদিস অস্বীকার করে। এই ভ্রান্ত মতবাদ আজকের নতুন কোনো মতবাদ নয়। এই ভ্রান্ত দলের যাত্রা শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা লগ্নে। তাদের সাথে আহলুস সুন্নাহ'র আলিমগণের প্রচুর দালিলিক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। সালাফদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তা দাফন হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও তারা থামেনি। তারা আল্লাহ তা'আলার শরীয়তকে নিজের প্রবৃত্তির শরীয়ত দিয়ে পরিবর্তন করতে সর্বাবস্থায় সচেষ্ট ছিল। এই মতবাদের প্রবক্তাদের উত্থান এবং ইতিহাস শিয়া সম্প্রদায়ের উত্থানের ইতিহাসের সাথে মিলে যায়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকালের পর সাহাবা আজমাঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নেতা ও খলিফা হিসাবে মেনে নেয়ায় শিয়ারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করা শুরু করে এবং ছিদ্দিকে আকবরের প্রতি অনুগত সাহাবীদেরকে কুফরের তকমা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবার ঘোষণা দেয়।

তৃতীয় শতাব্দীকাল পর্যন্ত হাদিস অস্বীকারকারীদের এই ধারার কথা কেউ জানতেনা। এবং তাদের কোনো আলোচনা ইতিহাসের সেসময়কার বই পুস্তকেও পাওয়া যায় না। বহু পরে ব্রিটিশরা যখন হিন্দুস্তানে ইসলামী শাসন আমলের একটি কেন্দ্রের দখল নেয় এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছিল তখন তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রথমত মুসলিম জনতার মনস্তাত্ত্বিক অঞ্চল থেকে ইসলামী ভাবধারা ও সঠিক বিশ্বাস তুলে নিতে হবে। এই চিন্তা সামনে রেখে তারা মুসলিম জনতার অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে অর্থলোভী ও প্রবৃত্তি পূজারী আলিমদের কাজে লাগিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে আদাজল খেয়ে নামে। প্রাথমিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন হিসেবে তারা আল্লাহ তা'আলার কুরআনকে শরীয়তের প্রধান উৎস বলে প্রতিষ্ঠা করে।

শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস তথা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিস সমূহকে প্রান্তিক বানিয়ে ফেলে। হাদিসকে অস্বীকারের প্রথম পর্যায় ছিল- হাদিসের বৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা। অতঃপর হাদিসের সাথে সম্পর্কিত শরীয়তের অন্যান্য বিধানের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা। এই মৌলিক দুটি বিষয় অর্জনের জন্য তারা বেশকিছু পথ বেছে নেয়। এর মধ্যে ছিলো হাদিসের মতন বা টেক্সট ও বর্ণনার পদ্ধতি এবং বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অগ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে পুরো হাদিসকে বাদ দিয়ে দেয়া।

এ ভ্রান্তির সূচনা ভারত বর্ষ থেকে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা ইরাক, মিশর, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডেও পাচার হয়। মিশরে মুনকিরিনে হাদিসের দাওয়াত শুরু হয় মুহাম্মাদ আলী পাশার সময়ে। সময়কালটি ছিলো ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ। সেসময় ইতালিতে প্রযুক্তি বিপ্লব শুরু হয়। পরবর্তীতে তা ফ্রান্সেও শুরু হয়। মিশরে হাদিস অস্বীকারের ধারা শুরু হয় প্রাচ্যবিদদের হাত ধরে। কয়েক ডজন প্রাচ্যবিদ তখন কায়রো ইউনিভার্সিটি এবং কায়রোতে অবস্থিত আমেরিকান প্রোটেষ্ট্যান্ট ইন্ডাঞ্জেলিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে কলা অনুষদ ও বিজ্ঞান অনুষদে পড়াতে এসেছিল। তাদের কিছু অনুসারী ও শিষ্য তৈরি হয়। এই অনুসারী ও শিষ্যদের মধ্য থেকেই একটি দল হাদিস অস্বীকারকারী তথা মুনকিরিনে হাদিসে পরিণত হয়। তাদেরকে সামগ্রিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. একদল সরাসরি রিদ্বা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর সাথে সকল সম্পর্ক বিনষ্ট করে।
২. আরেকদল জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনকে যথেষ্ট মনে করে ও সরাসরি হাদিস শাস্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে।
৩. তৃতীয় দল নিজেদের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদিসগুলোকে গ্রহণ করে এবং নিজেদের মতের বিপক্ষে হাদিসগুলোকে অস্বীকার করে। (তুরস্কের মেহমেদ গরমেজকে আমি এই তৃতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। এই ব্যাপারে আমার কাছে দালিলিক প্রমাণ রয়েছে। তবে আজকের আলোচনার বিষয় এটি নয়। আরেকদিন আলোচনা করা হবে। শুধু এখানে একটা নুকতা দিয়ে রাখলাম)

ঐতিহাসিক সূত্রমতে হাদিস অস্বীকারকারী দলগুলোর মৌলিক উৎস চারটি :

১. আধুনিক যুগের খারেজি সম্প্রদায়।
২. শিয়া।
৩. মু'তাজিলা।
৪. ওরেয়েন্টালিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত।

গত শতাব্দীর সত্তর এবং আশির দশক থেকে হাদিস অস্বীকারের এই ভ্রান্ত চিন্তা যারা পুনর্জীবিত করতে চাচ্ছিল তাদের মূল হোতা হলো আহমদ সুবহী মনসুর। যাকে

যায়োনিস্ট ও মার্কিনরা ইসলামী চিন্তক উপাধি দেয়। এই ব্যক্তি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি অনুষদ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করে সেখানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিল। ১৯৭৭ সালে তার কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সেখানে হাদিস অস্বীকারের বিষয়টি ফুটে উঠে। যার ফলে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে বরখাস্ত করে। এই লোক ইমাম বুখারী রহিমাল্লাহ'র মত মুহাদ্দিসকে ইসলামের শত্রু এবং কুরআনের শত্রু হিসেবে অভিহিত করে এবং ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে কুরআনকেই যথেষ্ট বলে প্রচার করতে থাকে। মিশরে তার এই মতবাদের সাথে রাশাদ খলিফা নামে আরেক ব্যক্তি যুক্ত হয়। আহমদ সুবহী মনসুর রাশাদের সাথে দেখা করতে আমেরিকায় যায়। অথচ এই রাশাদ ছিল সে সময়ের সবচেয়ে বড় যিন্দিক। যে ব্যক্তি নবুওতের দাবি করেছিল। আমেরিকা অ্যাসাইলেম দিয়ে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। অবশ্য নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে তাকে সেখানে হত্যা করা হয়। এই যিন্দিক হাদিসকে শয়তানের পক্ষ থেকে আসা বক্তব্য বলে মনে করত। কুরআনের কিছু আয়াতকে শয়তানী আয়াত বলে প্রচার করত। আহলুস সুন্নাহর আলিমগণকে পৌত্তলিক বলতো। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে কাফির বলতো। এবং সে দাবি করত, চল্লিশ বছর বয়সে তার কাছে নবুয়ত এসেছে। যারা তাকে অনুসরণ করবে তাদেরকে আল্লাহর কাছে কোনো হিসাব দিতে হবে না। সে নিজেকে মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ আলাইহিমুস সালাম থেকে বড় নবী দাবী করত। কেননা উক্ত নবী গনের মু'জিয়া বর্তমান সময়ের লোকেরা দেখতে পায়নি। সে তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলতো- 'তোমাদের নামাজ-রোজা-হজ্ব-যাকাত সবই ভুল এবং একজন রাসুল হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো তোমাদের এই ভুলগুলো শুধরে দেয়া।' মাআযাল্লাহ!

আহমদ সুবহী মনসুর আমেরিকা থেকে কায়রো ফিরে আসে। এসেই মসজিদের মিস্বার থাকে হাদিসের সমস্ত বিধানকে অস্বীকার করে অবমাননা করতে থাকে। সাধারণ মুসলমানরা তার এই বিভ্রান্তি বুঝতে না পারলেও হাদিস অস্বীকার বিষয়টি ধরতে পেরে তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। ফলশ্রুতিতে তাকে কয়েকসপ্তাহ কারাগারে কাটাতে হয়। ছাড়া পেয়ে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে কয়েক মাস লেকচারার হিসেবে কাজ করে। ইবনে খালদুন সেন্টারেও পাঁচ বছর কাজ করে। ইবনে খালদুন সেন্টার আমেরিকা ও ইহুদিদের অনুগত হিসেবে পরিচিত ছিলো এবং তাদের চিন্তাধারার প্রচার করত। ২০০০ সালে মিশরীয় পুলিশ এই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগে এই সেন্টারের পরিচালক সা'দ ইব্রাহিমকে গ্রেপ্তার করে। একপর্যায়ে সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়। গ্রেফতার এড়াতে আহমদ সুবহী মনসুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয়। সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল এন্ডডাউনমেন্ট ফর ডেমোক্রেসিতে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে চেয়েছিল। পরবর্তীতে সে নিজেই 'আল মারকাযুল আলাম লিল কুরআনিল কারিম - (Global centre for Quran)' নামে একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে।

২০০৪ সালে 'পিপল অফ কুরআন' নামে একটি ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করে। যেখানে সে

রীতিমত নিবন্ধ প্রকাশ করে যায়। তার বিভ্রান্তিমূলক বইপত্র এই সাইটে এবং অন্যান্য কিছু সাইটে এখনো পাওয়া যায়। আহমদ সুবহী মনসুরের প্রতিষ্ঠান সালাফদের মধ্য থেকে যারা কুরআন এবং হাদিস উভয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে ঘোষণা দেয়। কুরআনিস্টদের মতে হাদিস শব্দটি কুরআনেরই একটি ধারণা। আলাদা শাস্ত্র নয়। যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যে সমস্ত 'ক্বওলী' হাদিস রয়েছে তা তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলারই বক্তব্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে হাদিস শব্দের বারংবার উল্লেখ করেছেন। সুরা আ'রাফে এসেছে-

فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ الْحَاقِّ الْمُنُونِ

'এরপর তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে?'

সুতরাং তাদের বক্তব্য হলো- কুরআনুল কারীমের বাইরের কোন হাদিসে তথা কথায় তাদের ঈমান নেই।

এধারণার উপর ভিত্তি করে তারা বুখারী, মুসলিম, শাফেঈ ও মালেক সহ অন্যান্য সকল ইমামগণের বর্ণিত হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সেগুলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করাকে অস্বীকার করে। ইসলামের অংশ হিসেবে গণ্য করে না। সুবহী মনসুরের মতে- ইসলাম কুরআনের মাধ্যমে সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে সুরা মায়িদাতে বলেছেন-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'

তারা এও মনে করে যে, তারা তাদের এই দাবির মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসকল মিথ্যা হাদিসের (!) দায় থেকে মুক্ত করছে। এবং যে রিসালাত নবীকে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা কুরআনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা নবীর ওফাতের পর ইসলামকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। নিজেদের কর্মকাণ্ডকে বৈধ করার জন্য হাদিস আবিষ্কার করেছে। সাধারণ জনতাকে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

সুবহী মনসুর আরো বলেছে-

'আমি মনে করি বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য যে সমস্ত হাদিসকে তারা সুন্নাহ বলে তা মূলত একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি ছাড়া কিছুই নয়। যা বর্ণনাকারীর যুগের সাথে তাল

মিলিয়ে নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করেছে। ইসলাম এবং ইসলামের নবীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। হাদিস একটি মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে প্রচলিত ধর্মের নামে যুদ্ধকে বৈধতা দিতে হাদিস এসেছে। সুতরাং যুগে যুগে প্রচলিত সংস্কৃতি থেকে আমরা দূরে থাকি এবং পবিত্র কুরআনকে আঁকড়ে ধরি।'

মিশরের 'আশ শারকুল আওসাত' পত্রিকায় ২০০৪ সালের ২০শে জুলাই কুরআনিস্টদের সাথে মার্কিন লিবারেল গোষ্ঠীর একটি বৈঠকের সংবাদ প্রচারিত হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়- 'হাদিসকে প্রান্তিক বানিয়ে ফেলতে হবে। এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাদিস চর্চা ও পাঠদান থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা হাদিস মুক্তচিন্তা ও মুক্তবিশ্বাসের চর্চা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে একটি ধর্মীয় বাধা হিসেবে কাজ করে।'

এই কমিটির একজন সদস্যের বক্তব্য এমন ছিল যে, 'কুরআনিস্টদের প্রতিনিধি মুহাম্মাদ ওসমান মার্কিন লিবারেল গোষ্ঠীর কাছে এই মত ব্যক্ত করেন যে, মিশরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে হাদিস শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। যার অর্থ হলো ইসলামী মতবাদ প্রত্যেকের উপর চাপিয়ে দেয়া। অথচ মিশরের মুসলিম জনসংখ্যার সবাই সুন্নি নয়। সেখানে কুরআনিস্ট, শিয়া ও বাহাইজমসহ আরো অনেক মতবাদের অনুসারী রয়েছে।' আহমদ সুবহী মনসুরকে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করার পর তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছিল। সে কয়েক সপ্তাহ কারাগারেও ছিল। কিন্তু হাদিস অস্বীকারের কারণে সে জনগণের ক্ষোভের মুখে পড়ে। যার ফলে তার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাশ তাকে আদালতে নিয়ে আসা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০০ ও ২০০১ সালে বিচারের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়। এ সময় পুলিশ তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা তাঁর চিন্তার অনুসরণ ও প্রচার-প্রসার করছিল তাদেরকে গ্রেফতার করে। ফলে আহমদ সুবহী মনসুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে সেখানে পালিয়ে যায়। ২০০২ সালের জুন মাসে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে।

২০০০ সালের এপ্রিল মাসে কুরআনিস্ট মতবাদের মামলার রায় হয়। যেখানে একজন মহিলা সহ আটজন আসামীকে আদালত বিকৃত চরমপন্থী মতাদর্শ প্রচারের দায়ে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। এই আসামিদের বিপক্ষে যে সমস্ত অভিযোগ ছিল তার মধ্যে এটিও ছিল- তারা কাবাকে পৌত্তলিকদের উপসানালয় দাবি করে। এবং আরাফাতের ময়দানকে পবিত্র বলে অস্বীকার করে।



উস্মাহর মর্হীকহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব

মূল : শায়খ আহমদ মুসা জিব্রীল
পরিমার্জনা : আসিফ আদনান

আমাদের আজকের আলোচনা একজন ব্যতিক্রমী চরিত্রকে নিয়ে।

গীবত, পরনিন্দার কিংবা অপরের মানহানির ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এর বক্তব্য আগে একবার স্মরণ করে নেয়া যাক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার সাফিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যাপারে আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে জানতে চাইলেন। সাফিয়ার ব্যাপারে তুমি কী মনে কর? জবাবে আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তার হাত দ্বারা এক ধরনের ইঙ্গিত করলেন। কেবল সাধারণ একটা ইঙ্গিত। অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে এঙ্গি ইঙ্গিতের মাধ্যমে আইশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সাফিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) একটু বেঁটে। যদিও আইশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করেননি কিন্তু সেই ছোট্ট ইঙ্গিতের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বললেন, যদি তুমি এটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে তাহলে তা পানির রঙ পরিবর্তন করে ফেলতে পারত।

ছোট্ট অথচ কত সুস্বাদু এবং গুরুতর একটি ব্যাপার, চিন্তা করুন! সুতরাং আমরা কী বলছি তা নিয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন: “তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?” (৪৯:১২)

ধরুন, আপনার পরিচিত কেউ মারা যাবার পর র আপনি তার শরীরের উপর ছুরি চালিয়ে তার গোশত কেটে কেটে খাচ্ছেন; কী জঘন্য ব্যাপার! আর এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মানহানী করা বা গীবত করার তুলনা করেছেন। শুধু গীবত থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট না, বরং মুসলিম ভাইদের সম্মান রক্ষাও আমাদের কর্তব্য। আজ এমন অনেক মুসলিম ভাই আছেন যারা প্রতিনিয়ত গীবতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন। তবে একটু চিন্তা করলে দেখা যায়

বর্তমান অবস্থায় এটা মোটেই অসম্মানের কিছু না। যারা গীবত করছেন বা কুৎসা রটাচ্ছে তাদের দিকে তাকালে মনে হয় আজ কুৎসার লক্ষ্যবস্তু হওয়াটাও সম্মানের ব্যাপার। মডার্নিস্ট, সংস্কারপন্থী কিংবা আপোসকামীরা যদি আপনাকে বিভিন্ন রকম ট্যাগ দেয়, তিরস্কার কিংবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাহলে আপনার খুশি হওয়া উচিত। তারা যত আপনাকে অপমানিত করতে চাইবে আপনি তত দিন দিন ওপরে উঠবেন। তবে নিজের সামনে কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত হতে দেখলে আপনার নির্দিষ্ট করণীয় আছে।

রাসুল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে রটানো কুৎসা প্রত্যাকান করে কিংবা কেউ গীবত করছে এমন কোন মজলিসে যদি কেউ বলে ‘চুপ কর!’, তাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া নিজের উপর ওয়াজিব করে নেন।

মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে কটু কথা বলা থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন, আপনি বললেন, ‘চুপ কর! যদি এই অবাস্তুর কথা বলা তুমি বন্ধ না করো তাহলে আমি চললাম’। তাহলে আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করা নিজের ওপর ওয়াজিব করে নেন।

গীবতের প্রতিবাদ করুন না পারলে স্থান ত্যাগ করুন। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) আল্লাহ্ আনহা) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (ﷺ) বলেন,

যে ব্যক্তি গীবাহ করার মাধ্যমে ভাইয়ের গোশত খায়, তাকে আগুনে পোড়ানো আল্লাহর অধিকার। (আহমাদ -৬/৪১) (আত তাবারানী) ২৪/১৭৬) আলবানী রহ: একে সহীহ বলেছেন।

একদিকে গীবাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিকে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়াকে আল্লাহ নিজের অধিকার সাব্যস্ত করেছেন যে, অন্যদিকে একই রকম আরেকটি হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানী করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের হুক্ম তার মুখ থেকে সরিয়ে নিবেন।

একথাগুলো স্মরণ রাখবেন।

আজ আমরা এমন একজন মহান ব্যক্তির কথা আলোচনা করবো যার ব্যাপারে যা বলা হয়ে থাকে তার সাথে বাস্তবতার অনেক ফারাক। আমাদের উচিত তার সম্মান রক্ষা করা। এটা আমাদের জন্যও সম্মানের ব্যাপার। কারণ আমরা না চাইলেও তিনি ঠিকই সম্মানীত হতে থাকবেন। এরা হচ্ছেন উম্মাহর মহীরুহ। ইতিহাসে তাঁদের নাম সোনালী অক্ষরে লেখা। প্রত্যেক যুগের সৎ একনিষ্ঠ মানুষরাও তাঁদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন। তাই হিংসুকরা যতই মন্দ বলুক না কেন এটা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। কিন্তু

আমরা যদি তাঁদের সম্মান রক্ষায় কিছু করতে পারি সেটা আমাদের জন্যই সম্মান বয়ে আনবে। ইন শা আল্লাহ এর বিনিময়ে বিচার দিবসে আমরা উত্তম প্রতিদান পাব। এ বিষয়টি আমাদের বোঝা দরকার। এই মহান ব্যক্তির আপন-আমার সমর্থনের মুখাপেক্ষী নন, তবে তাঁদের সম্মান রক্ষার চেষ্টার মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করি।

আজ যে মহামনীষীকে নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, তিনি সম্ভবত গত দু শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত মানুষদের একজন এবং সম্ভবত বিদআতী, অজ্ঞ এবং ভণ্ডদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষদের অন্যতম।

তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবনু সুলাইমান আত তামীমী। আরব উপদ্বীপে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী সংস্কারক এবং মুজাদ্দিদ। গভীর মনোযোগের সাথে তার কাহিনী শুনুন। যে কেউ তার দেখানো পথ ধরে হাঁটতে পারে। তাঁর কাজের সাথে সুলতান নূরুদ্দীন আল-জিৎকির কাজের কিছুটা মিল খুঁজে পাবেন। তবে দুজনের স্বতন্ত্র স্টাইল ছিলো।

ইমাম মুহাম্মাদ আসলে কী করেছিলেন? খুব বিশেষ কিছু না, বরং তিনি যা করেছিলেন আমাদের মাঝে যে কেউই তা করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের ১১১৫ বছর পর তাঁর জন্ম। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে। তিনি সাহাবী বা তাবয়ী ছিলেন না। মাত্র আড়াইশ বছর আগের মানুষ; যার বংশধররা এখনও আরব উপদ্বীপে আমাদের মাঝে বসবাস করছেন।

এ মানুষটার ব্যাপারে বলার আগে সেই সময়টাতে তার চারপাশের অবস্থা কেমন ছিল তা আপনাদের বলতে চাই। তিনি এমন সময়ে জন্ম নেন যখন তাঁর ভাষ্যমতে, ৪০০ বছর ধরে উম্মাহ ভাল কিছু দেখেনি। অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি, বিদআহ, শিরক এর জঞ্জালে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। আমরা এখানে বিশেষভাবে আরব উপদ্বীপের কথা বলছি। জাযিরাতুল আরব, অর্থাৎ যেটাকে বর্তমানে সউদী আরব, হেজাজ ইত্যাদি নামে আমরা চিনি। সে সময়টা আরব উপদ্বীপ ছেয়ে গিয়েছিল কুব্বায়। কুব্বা হল কবরের ওপরের তৈরি করা গম্বুজ।

বাঁধাই করা এবং গম্বুজওয়ালা বিশিষ্ট কবরগুলোর কাছে মানুষ ইবাদতের জন্য যেত। ঠিক যেভাবে ক্বাবার চারপাশে করা হয় তেমনিভাবে মানুষ এ কবরগুলোর চারপাশে তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করতো। আল্লাহর পরিবর্তে কবরবাসীদের কাছে মানুষ বিভিন্ন জিনিষ চাইতো (যেমন সম্পদ, সন্তান, সুস্থতা ইত্যাদি)। আল্লাহকে বিশ্বাস করেও কুরাইশ ৩৬০ দেবদেবীর ব্যাপারে যে কাজগুলো করত অনেকটা সেরকমই। আরবে কিছু বিশেষ গাছ ছিলো; কোন মহিলা গর্ভ ধারণে করতে অক্ষম হলে সে তখন এই

গাছগুলোর কাছে আবেদন করত। আবার স্ত্রী- মিলিয়ে দেয়ার দোয়া নিয়ে পুরুষরা যেতো সেই নির্দিষ্ট গাছ, কিংবা কবরের কাছে যেতো। আজ হয়তো এসব কথা শুনে আপনি হাসবেন, কিন্তু এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা।

এগুলো সুস্পষ্ট শিরক। মানুষ এসবে লিপ্ত ছিল। সরাসরি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা হতো। এমনকি কিছু সাহাবি (রাখিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন) এর কবরের ওপর গম্বুজ বানিয়ে তাঁদের কাছে চাওয়া হত, ইবাদত করা হতো।

এভাবেই মূলত শিরকের গোড়াপত্তন হয়। শিরকের উৎপত্তি কিভাবে? ধার্মিক লোকেরা মারা যাবার পর লোকেরা প্রথমে তাঁদের ছবি তৈরি করে। একসময় সেগুলো পরিণত হয় মূর্তিতে। তারপর কালক্রমে একসময় সেই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হয়। পৃথিবীতে এভাবেই কিন্তু মানবজাতির মধ্যে শিরক শুরু হয়েছিল।

কেন তারা প্রথমে ছবি সংরক্ষণ করেছিল? তখনকার লোকেরা যুক্তি দিয়েছিল, এই ধার্মিক লোকগুলোর কথা আমাদের স্মরণ রাখতে দাও যাতে আমরাও তাদের মত ধার্মিক হতে পারি। উদ্দেশ্য কিন্তু ভালো ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেই ছবিগুলোই পরিণত হয়েছিল মূর্তিতে, মিথ্যে ইলাহতে। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম ভাবল আমরা তো এদের মতো হতে পারব না তাই বরং আমরা এদের ইবাদত করব এবং এটা ছিল চরম ভ্রষ্টতা।

আমরা যে সময়টার কথা বলছি তখন ইয়েমেনেও একই সমস্যা ছিল। ইরাকেও - সেখানকার সেসময় ইমাম আবু হানিফার কবরের ওপর গম্বুজ ছিল, মানুষ সেখানে ইবাদত করতো। ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের অবস্থা ছিল এরচেয়েও শোচনীয়। আলজেরিয়াতেও একই ব্যাপার। মিশরে তো শুধু মূর্তিপূজাই নয় বরং পিরামিড এবং ফিরাউনদের রেখে যাওয়া নিদর্শনগুলোরও ইবাদত করা হতো। এর মাধ্যমে কিছু লোক আবার শিরকপূর্ণ অতীতে ফিরে গিয়েছিল। মৃত এবং কালের গহবরে হারিয়ে যাওয়া ফিরাউনদের স্মৃতিকে তারা আবার পুনরুজ্জীবিত করেছিল। অথচ আমাদের আলোচনা কোন কাফির সম্প্রদায়কে নিয়ে না, এরা সবাই মুসলিম ছিল। মুসলিমরা তখন কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ থেকে এতো দূরে সরে গিয়েছিল যে তারা পুনরায় আবার ফিরে গিয়েছিল এসবে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই এগুলোর কিছু না কিছু প্রভাব ছিল।

এমনই এক বিশৃঙ্খল অরাজক পরিস্থিতিতে জন্ম নেন মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব। এবং তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন এক বিশাল দায়িত্ব।

চলবে...

[শায়খ আহমাদ মুসা জিব্রীল হাফিয়াহুল্লাহ এর 'Heroes Of Islam - Muhammad Ibn Abdul Wahhab' থেকে অনূদিত। অনুবাদ করেছেন, আবু মুআয ইবনে শামস]



১.

যদি তুমি রাতে কিয়ামুল লাইল
আর দিনে সিয়াম রাখতে সক্ষম
না হও, তবে জেনে রাখো -
নিঃসন্দেহে তোমার গুনাহ
তোমায় শিকল বেঁধে
রেখেছে বলেই তুমি
বঞ্চিত!

- ইমাম ফুযাইল বিন ইয়ায রহ
[সিয়াকু আলামিন নুবাল্লাঃ ৭/৪০১]

২.

গোপনে অন্য কোন
ব্যক্তির জন্য করা দুয়া
সবচেয়ে তাড়াতাড়ি
কবুল হয়।

- ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)
[মাজমুউয়াল ফাতওয়া, ২৮/৯৬]

৩.

অভিযোগ করতে হবে
শুধু আল্লাহ তাআলার
কাছে, যেমনিভাবে নেককার
বান্দা (ইয়াকুব আলাইহিস
সালাম) বলেছিলেন, “আমি
আমার অসহনীয় বেদনা ও
আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু
আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।

- ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)
[মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/২৪৪]

৪.

আজকে জমিনের উপর,
আগামীকাল জমিনের নীচে।

- ইবনুল জাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ
[সায়িদুল খাতির, ৪৭২]

৫.

যে ব্যক্তি কোনো পাপ, বিদাত বা কুফরীর
জন্য কাউকে অভিনন্দন জানালো, সে নিজেকে
আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষের সম্মুখীন করল।

- ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ)
[আহকামু আহলিয়-যিম্মাহ: ১/১৬১]



